নারীর উক্তি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

নারীর উক্তি

নারীর উক্তি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রী যাঁদের সম্পদ, হ্রী যাঁদের ভূষণ, ধী যাঁদের সহায়; স্নেহ যাঁদের অগাধ, ক্ষমা যাঁদের অপার, ধৈর্য যাঁদের অসীম; কর্ম যাঁদের বন্ধু, ধর্ম যাঁদের রক্ষক; মন যাঁদের সরল, বাক্য যাঁদের মধুর, সেবা যাঁদের অক্লান্ত; যাঁরা আত্মসুখে উদাসীন, পরদুঃখে কাতর, অতি অল্পে সন্তুষ্ট— সেই প্রাতঃস্মরণীয়া, সেকালের আদর্শ-স্থানীয়া পরিচিত-অপরিচিত বঙ্গনারীকুলের উদ্দেশে এই সামান্য গ্রন্থখানি অর্ঘ্যস্বরূপ উৎসর্গীকৃত হল। তাঁদের সঞ্চিত পুণ্য যেন আমাদের একালে দিক্‌নির্ণয় করবার আলো দেখায়, তাঁদের সম্মিলিত শক্তি যেন আমাদের নবযুগের পথে চলবার বল দেয়।

গ্রন্থকর্ত্রী

সূচীপত্র

বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার

এ দেশের গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রীশিক্ষার ফল ভালো কি মন্দ হইয়াছে, এই বিষয়ে সেদিন কোনো একটি বিদুষী-মণ্ডলীতে বাদপ্রতিবাদ হয়। শ্রীমতী ক আলোচ্য বিষয়টির পক্ষে, এবং শ্রীমতী খ সজোরে বিপক্ষে বলার পর, শ্রীমতী গ ঘ প্রভৃতি দুই বিপরীতপক্ষ যথাক্রমে সমর্থন করিলেন। অনেক প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক আলোচনান্তে, অধিকাংশের মতে সাব্যস্ত হইল যে, আমাদের ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষার ফল ভালোই হইয়াছে।

একজন প্রবীণা বলিলেন, তাঁহাদের কালে স্ত্রীশিক্ষার কুফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিতে শুনিতে তাঁহার এই কথাটি মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ছোটো ছোটো ভাইবোনের তত্ত্বাবধান, রন্ধন ও সেলাই প্রভৃতি গৃহকর্মে পটু হইয়া, উপরন্তু নিজেকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে হইবে ; এবং আজ-কালকার মেয়েরাও যদি এই কথাটি স্মরণ রাখে তবেই স্ত্রীশিক্ষায় সুফল ফলিবে, নচেৎ নহে। কেহ বলিলেন, কিছু কিছু পথভুল হইলেও, অশিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষা শ্রেয়। কেহ বলিলেন, এখনও স্ত্রীশিক্ষার ফলাফল বিচারের সময় আসে নাই।

কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল স্ত্রীশিক্ষা, এবং অন্তত পঁচিশ বৎসর হইল উচ্চতর স্ত্রীশিক্ষা, বাংলা দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। অতএব কোন্ পথে যাইতেছি, ইহা ঠিক কি ভুল, এবং আমাদের গম্যস্থান কোন্‌টি, তাহা বিচার করিবার সময় কি হয় নাই? কর্মস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাস্রোত চিরদিন পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই আমরা আজ পর্যন্ত ভরসা পাই যে মানব, ভ্রান্তির সংস্কার করিতে করিতে ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

নারীর উক্তি

আমার তো মনে হয় সামাজিক সকল অনুষ্ঠানের ন্যায়, স্ত্রীশিক্ষার ফল সম্পূর্ণ ভালোও হয় নাই, সম্পূর্ণ মন্দও হয় নাই। সুতরাং এক কথায় বা সমগ্রভাবে ইহার বিচার করা অসম্ভব। দুঃখের বিষয়, সমাজ সংস্কার করিতে গেলেই পুরাতন মন্দের সহিত কতক ভালোও লোপ পায়, এবং নূতন ভালোর সহিত মন্দও আসিয়া পড়ে। বিশেষত আমাদের সমাজ যেরূপভাবে গঠিত, তাহাতে এই এক পরিবর্তনে বিস্তর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সামাজিক প্রথা-সকল সুনির্দিষ্ট পরস্পরসাপেক্ষ ও ধর্মসংশ্লিষ্ট ; এবং পরিবর্তনের কারণ বাহির হইতে অযাচিত অতর্কিত-ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, দেশের অন্তর হইতে ক্রমশ স্বতঃই উদ্ভূত হয় নাই। সুতরাং যদি কোনো ভুল হইয়াও থাকে, তজ্জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তকদের দোষ দেওয়া যায় না। ফলাফল দেখিয়া আমাদের পক্ষে এখন ভুল ধরা যত সহজ, তাঁহাদের পক্ষে তখন তত সহজ ছিল না।

কিন্তু সেকালের হিন্দু স্ত্রীলোকের তুলনায় একালের শিক্ষিতা ভারত-মহিলা ভালো কি মন্দ, তাহা সম্যক্‌রূপে বিচার করা কঠিন হইলেও, বিশ্লেষণ করিয়া শেষোক্তের দোষগুণ দেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ এবং কার্যত ফলপ্রদ। কেননা, তাহাতে নীরত্যাগপূর্বক ক্ষীরগ্রহণের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। বলা বাহুল্য, কোনো সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্তমান স্কুলকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে-সকল বঙ্গরমণী, মাতা পত্নী দুহিতা ও ভগ্নী -রূপে সুখেদুঃখে ঘরসংসার করিতেছেন, তাঁহারাই সম্প্রতি বিচারাধীন। তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, এবং দিনে দিনে তাহা বৃদ্ধিলাভ করিতেছে।

নব্যশিক্ষিতার বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ লোকে সাধারণত উপস্থিত

করিয়া থাকে, পর্যায়ক্রমে সেগুলি আলোচনা করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

প্রথম, ধর্মভাবের হ্রাস। ধর্ম বলিতে যে-পরিমাণে আচার বিচার, পূজা আহ্নিক, ব্রত উপবাসাদি বুঝায়, তাহার প্রতি নব্যদলের আস্থা যে কম, তাহা সর্ববাদিসম্মত। ইহার এক কারণ ব্রাহ্মধর্মের প্রচলন, অন্যতম কারণ পুরুষদিগের হিঁদুয়ানিতে শৈথিল্য। কিন্তু মানসিক ধর্মভাবের হ্রাস স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। দুই-চার জনের অবিশ্বাস, এবং দুই-চার জনের বিশ্বাস শিথিল বা প্রাণহীন হইলেও, ভারতমাতার এখনও এমন দিন আসে নাই, ঈশ্বর করুন যেন এমন দুর্দিন কখনও না আসে— যে, তাঁহার কন্যাগণের ধর্মে মতি নাই। ধর্মের যে অংশ কর্মে প্রকাশ, যাহার এক নাম সুনীতি, সে সম্বন্ধে একই বক্তব্য। ধর্মের পথ চিরদিনই শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়, সুতরাং তাহার পারিপার্শ্বিক পথিক বা বিপথিক কোনো দেশকালপাত্রে আবদ্ধ নহে। তবে সামাজিক শাসন যে এ বিষয়ে গুরুতর সহায়, তাহা নিঃসন্দেহ। এবং সমাজসংস্কারকগণের দৃষ্টি রাখা উচিত যেন এক দিকে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গেই অপর দিকে সুদৃঢ় গঠন আরম্ভ হয়। স্ত্রীশিক্ষাপক্ষপাতীর এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া অত্যাবশ্যক, কারণ উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই বলবৎ।

দ্বিতীয়, নম্রতার অভাব। ইহা শিক্ষার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। কথায় বলে অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। যে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত, সে জানে শিক্ষা অনন্তপারং— সুতরাং হাঁটুজল পাওয়ায় বিশেষ বাহাদুরি নাই। অতএব যাঁহারা অহংকারব্যাধিগ্রস্ত, তাঁহাদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়াই একমাত্র সুচিকিৎসা! প্রথম স্ত্রীশিক্ষার আমলে যদিও এ রোগের

প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, আশা করি আজকাল বৎসরে বৎসরে গণ্ডা গণ্ডা এফ. এ. - বি. এ.-উপাধিধারিণীর মধ্যে কেহ মনে করেন না যে 'আমি একজন'।

বাধ্যতার অভাবও এই শ্রেণীভুক্ত। শিক্ষার ফলে কিঞ্চিৎ মানসিক স্বাধীনতা, উক্ত স্বাধীনতার ফলে নিজস্ব মতামত গঠন, এবং তাহার ফলে ভিন্ন মতের সহিত কখনও কখনও অল্পবিস্তর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভদ্র ও বিনীত ভাবে নিজমত সমর্থন করিতে পারিলে আপত্তি কী। কার্যক্ষেত্রে তো 'জোর যার মুলুক তার' হইবেই। রমণীর জোর খাটাইবার স্বতন্ত্র মুলুক চিরকালই নির্দিষ্ট আছে; যাহাতে বুদ্ধিবিবেচনাপূর্বক সে জোর খাটাইতে পারে, তাহাই কি স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য নহে? আমার তো মনে হয় অন্ধ দাসত্ব অপেক্ষা স্বেচ্ছাসেবার মাহাত্ম্য বেশি। একটা বয়সের পর অতিবাধ্যতার আদান-প্রদান দুইই ক্ষতিজনক, কারণ তাহাতে এক-পক্ষের অত্যাচারপ্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়, অপরপক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিবিকাশের হানি হয়। যদি বঙ্গরমণী এত নির্বিবাদে ও নির্বিচারে পুরুষজাতির চরণে যন্ত্রবৎ পূজা না ঢালিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের দেবতারাও মানুষ হইবার আর-একটু বেশি চেষ্টা করিতেন। ধীশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া যাহাতে শ্রী ও হ্রী নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখিলেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত।

তৃতীয়, গৃহকর্মে অক্ষমতা বা তাচ্ছিল্য। প্রথমটি আংশিকভাবে স্বীকার্য, কারণ ইস্কুলকলেজের তাড়নায় পূর্বের ন্যায় অনায়াসে ও যেন খেলাচ্ছলে গৃহকর্ম শিখিবার সুযোগ কম। নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া ইস্কুল হইতে আসিয়া পড়া তৈরি করা, পরীক্ষার সময় মাথায় মাথায় ভাবনা পড়া (এবং সম্ভবত মাথাধরা!)— ইহার মধ্যে বড়ি

দিবার বা পান সাজিবার অবকাশ কোথায়? তাহার উপর ইদানীং অনেক স্থলে কন্যারত্নগুলিকে যেরূপ চৌষট্টিকলাকুশলা করিয়া তুলিবার প্রয়াস দৃষ্ট হয়, তাহাতে কোনোপ্রকার কার্যকর শিক্ষা সম্বন্ধে হতাশ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তথাপি যখন দেখি অনেক নব্যশিক্ষিতাই সুগৃহিণী ও রন্ধননিপুণা, তখন আমি বলিতে বাধ্য যে অধিকাংশের অপটুতা ইস্কুলের শিক্ষাপ্রভাবে নহে, গার্হস্থ্য শিক্ষার অভাবে। মায়ের দৃষ্টান্ত এবং উপদেশে নব্যদলেরও গৃহিণীপনা শিখিবার যথেষ্ট সুবিধা আছে। কেবল পূর্বে যাহা অবশ্যকর্তব্য সেইজন্য একমাত্র শিক্ষণীয় ছিল, এখন তাহার অনেক ভাগিদার জুটিয়াছে বলিয়া সময় সংক্ষেপ, এবং সচেষ্ট ব্যবস্থা আবশ্যক। ইস্কুলেরও এ বিষয় সচেতন হওয়া উচিত, কারণ ইস্কুল ও গৃহের পরস্পরসাহায্য ভিন্ন শিক্ষার সম্পূর্ণতা অসম্ভব। মেয়েকে ইস্কুলে দিয়াই যদি মনে করি তাহার ইহকাল-পরকালের পথ পরিষ্কার হইল, তাহা হইলে ইস্কুল বেচারার প্রতি একটু জুলুম করা হয়। আবার বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরও মনে রাখা উচিত যে, পরীক্ষা দেওয়াই নারী-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। যে পিতামাতার সাধ্যে কুলায়, তাঁহারা যদি ইস্কুলে একেবারে না দিয়া বাড়িতে কন্যাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন কিংবা তাহার সুবিধা না হইলে অন্তত তাদের পরীক্ষা দিতে নিবৃত্ত করেন, তাহা হইলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালী শিখিবার কোনোই বাধা থাকে না।

গৃহকর্মে তাচ্ছিল্যের অভিযোগ গুরুতর, কিন্তু আশা করি ভিত্তিহীন। আমি তো স্বকর্ণে কোনো নব্যার মুখে গার্হস্থ্যকর্ম সম্বন্ধে অবজ্ঞাপ্রকাশ কখনও শুনি নাই। যে গৃহধর্ম নারীজীবনের সারবস্তু, যাহার জন্য সমাজে নারীর স্থান ও মান, তাহার তুচ্ছতম কর্তব্যকর্মকেও যে রমণী হেয়জ্ঞান

করে, সে কৃপাপাত্র অতি দীন। তবে কালভেদে অবস্থাভেদে কর্তব্যের পার্থক্য হইয়া পড়ে। 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা'ই প্রধান কর্তব্য। যাহার দাসদাসী রাখিবার সামর্থ্য আছে, সে যদি তাহাদের দ্বারা অধিকাংশ গৃহকর্ম করাইয়া লয়, এবং কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ করতঃ সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইতে পারে, তাহাতে ক্ষতি কী? বিশেষত তাহার ফলে যদি সে আলস্যে দিনপাত না করিয়া অন্যপ্রকার সৎকার্যে মনোনিবেশ করিবার অবসর পায়। তথাপি আমার মনে হয় যে, বিবাহরূপ অনিশ্চিত ঘটনার উপর যখন নারীজীবনের সমস্ত নির্ভর, এবং ভাগ্যদেবীও চঞ্চলা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তখন সকল-প্রকার গৃহকর্ম বালিকামাত্রকেই শেখানো উচিত। আমার কোনো আত্মীয়া বলেন যে 'ঘাড়ে পড়িলেই মেয়েরা সব কাজ করিতে পারে'। কিন্তু আমি তাঁহার মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি না। অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চচ্চড় করিবেই। এবং যদিও কেহ কেহ নিজগুণে পূর্ব শিক্ষাভাব পূরণ করিয়া লইতে পারেন, অধিকাংশের পক্ষে অভ্যাসই প্রবল হয়। যাহা করিতে পারি তাহাই করিতে ভালো লাগে, এবং অনভ্যস্ত কাজ করিতে স্বভাবতই অনিচ্ছা বোধ হয়। সাহিত্যানুরাগ সংগীতানুরাগ যেমন স্বভাবে না থাকিলেও শিক্ষাগুণে কতকপরিমাণ উদ্রেক করা যাইতে পারে, গৃহকর্মানুরাগ তেমনি বাল্যাবধি জন্মাইয়া দেওয়া উচিত। যদিও ধনী গৃহিণীর রন্ধন করা কখনও আবশ্যক না হইতে পারে, তবুও আত্মীয়বন্ধুকে স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া খাওয়াইবার বিশুদ্ধ চিরপ্রচলিত আনন্দ হইতে পিতামাতা কেন তাহাকে বঞ্চিত করিবেন? জানা থাকা চাই, অভ্যাস রাখা চাই। তার পর কে কোন্ কাজে কতটা সময় ক্ষেপণ করিবে না-করিবে, সে তাহার কর্তব্যবোধ অবস্থা ও অভিরুচির উপর নির্ভর।

চতুর্থ, স্বাস্থ্যহানি। এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত পার্থক্য এত বেশি যে, কোনো সাধারণ নিয়ম বাহির করা কঠিন। তবে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে দেখিতে পাই যে, আমাদের মধ্যে দিদিমার অপেক্ষা মায়ের, এবং মায়ের অপেক্ষা মেয়ের শরীর ক্রমশই খারাপ হইতেছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাই ইহার একমাত্র কিংবা প্রধান কারণ কি না তাহা বিবেচ্য। শরীরতত্ত্ববিৎ এবং চিকিৎসকই এ স্থলে উপযুক্ত বিচারক। তবে স্বল্প অভিজ্ঞতায় এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, অধিকাংশ বঙ্গরমণীর শরীর মন ও ভবিষ্যৎ জীবনের গঠন স্মরণ রাখিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কঠিন সংগ্রামে তাহাদের যোগ না দিতে দেওয়াই ভালো। যে-পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাহাতে ব্যয় হয়, সেটি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখাই যুক্তিসংগত, নহিলে আবশ্যককালে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরীক্ষা ভিন্ন কি বিদ্যালাভ হয় না? এ বিষয়েও মনোযোগ করিলে পিতামাতা কন্যাগণকে শিক্ষার কুফল হইতে উদ্ধার করিয়া সুফল দান করিতে পারেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষের ভবিষ্যৎ জীবন যখন এমন স্বতন্ত্র ছাঁচে ভগবান ঢালিয়াছেন, তখন শেষ পর্যন্ত তাহাদের একইরকম শিক্ষা দেওয়া কখনই সমীচীন নহে। যাহার যাহা প্রধান কর্তব্য হইবে তাহাই সুসম্পন্ন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রত্যেককে প্রথমে দিয়া, তাহার উপর নাহয় অলংকারস্বরূপ পরে কিছু যোগ করা যাইতে পারে। অবশ্য সন্তানশিক্ষার ভার যে মাতার হস্তে, তাঁহার পক্ষে কোনো শিক্ষাই অনাবশ্যক বলা যায় না, এবং তাঁহার সহৃদয় সহানুভূতির ক্ষেত্র যতই প্রশস্ত হয় ততই ভালো। কিন্তু স্বাস্থ্য লাবণ্য কর্মক্ষমতা প্রসন্নতা সৌজন্য প্রভৃতি গৃহিণীজনোচিত গুণ যাহাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শরীরমনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, এবং উভয়েরই

স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য আছে। এক দিকে অতিমাত্রায় উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে, অপর দিকে ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য মানে সামঞ্জস্য, এবং সামঞ্জস্যই নারীজীবনের মূলমন্ত্র। তাহার সব শিক্ষাদীক্ষা যাহাতে সেই সাম্যকে অতিক্রম না করে ও একটি সহজ শ্রীর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে, তাহাই বাঞ্ছনীয়। নিছক পণ্ডিত সওয়া যায়, কিন্তু নিছক পণ্ডিতা অসহ্য! শরীরমনের গঠনের ন্যায়, বুদ্ধিবৃত্তির গঠনেও স্ত্রীপুরুষের যে একটি ভগবদ্দত্ত প্রভেদ আছে, তাহা বজায় রাখিতে পারিলেই ভালো। পুরুষালী মেয়ে বা মেয়েলী পুরুষ, কোনোটিই সমাজে আদৃত হয় না। বিদ্যাদানের সময় সে কথা সর্বদা স্মরণীয়। সেকালের রমণীগণের মধ্যে প্রায়শঃ যে শরীরমনের স্ফূর্তি উদ্যম উৎসাহ পরিশ্রমক্ষমতা সরসতা ও প্রফুল্লতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় আজকালকার অনেক মেয়েকে যেন নিস্তেজ নীরস ও নিরানন্দ মনে হয় বলিয়াই এত কথা বলিলাম। জানি না শিক্ষার সহিত, বা শারীরিক স্বাস্থ্যের সহিত এই পরিবর্তনের কতদূর যোগ, —কিন্তু কিছু আছেই। অন্তত মানসিক স্বাস্থ্যের কোঠায় পড়ে নিশ্চয়। আগেকার মেয়েরা যেমন প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে পারেন, হাসিতে পারেন, কথায় ও কাজে অনেক স্থলে যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং চতুরতার পরিচয় দিয়া থাকেন, পরকে যেমন আপন করিতে পারেন, সর্বাবস্থায় যেমন একটি সহজ সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন; আজকালকার অনেক শিক্ষিত মেয়ে তেমনটি পারেন না কেন? উচ্চশিক্ষার মধ্যে কি এমন-কিছু আছে যাহাতে মানুষকে একটু শুষ্ক, একটু স্বার্থপর, একটু নির্লিপ্ত, একটু ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলে? যদি প্রমাণ হয় যে, সে শিক্ষায় মেয়েদের স্বাস্থ্য ভগ্ন এবং মন সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শতগুণেও সে দোষ ঢাকিবার নয়।

পঞ্চম, বিলাসিতা ও আমোদপ্রিয়তা। ইহার কি সত্যই বৃদ্ধি হইয়াছে, না, প্রকারান্তর হইয়াছে মাত্র? সেকালের মেয়েরা গয়না ভালোবাসিতেন; একালের মেয়েরা হয়তো কাপড় বা অপরাপর শৌখিন দ্রব্য ভালোবাসেন, যাহার আমদানি সম্ভবত তখন এ দেশে হয় নাই। সুন্দর জিনিস ভালোবাসা চিরকালই মেয়েদের একটি রোগবিশেষ, এবং দুঃখের বিষয় সুন্দর জিনিস প্রায়ই দামী হয়! কালভেদে সৌন্দর্যের উপকরণের পরিবর্তন হয় মাত্র। অবশ্য বসন অপেক্ষা ভূষণ স্থায়ী, এবং অসময়ের বন্ধু। সে হিসাবে এ পরিবর্তন মন্দ বলিয়া স্বীকার্য। তবে কালক্রমে অন্য যে-সকল পরিবর্তন হইয়াছে ইহা তাহারই অন্তর্গত, এবং বোধ করি এ দোষ শিক্ষিতাদের মধ্যে আবদ্ধ নহে। যাহা-কিছু বদল দেখা যায়, সবই (বিশেষত মন্দগুলি!) শিক্ষার ঘাড়ে চাপানো অন্যায়। আসলে আর্থিক অবস্থাই বিলাসিতার ন্যায়ান্যায়ের পরিমাপ। একজনের পক্ষে যাহা দুষ্প্রাপ্য শখমাত্র, অন্যের পক্ষে হয়তো তাহাই অনায়াসলব্ধ চিরাভ্যস্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। যাহার যাহা সমাজ বা 'দল', তাহার সহিত সমপদক্ষেপে চলাই নিরাপদ, বাড়াবাড়ি করিলেই দৃষ্টিকটু হয়। কাহাকে কী শোভা পায়, তাহা অন্যে ঠিক বলিতে পারে না। এরূপ অনির্দিষ্ট বিষয়ের মাপকাঠি নিজের মনেই খুঁজিতে হয়। তবে যখন আমাদের ভাঙনের মুখে বাস, ও সকলেরই কিছু-না-কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আছে, এবং নানা কারণে ব্যয়ের দিক বাড়িতেই চলিয়াছে, তখন সুগৃহিণীর পক্ষে মিতব্যয়িতাই প্রশংসার্হ, শাস্ত্রেরও তাই উপদেশ। যিনি নিজের সংসার সুচারু অথচ সংযত রূপে চালাইতে পারেন, আজকালকার বিশৃঙ্খলার দিনে তিনিই যথার্থ গৃহলক্ষ্মী। আর যে-কোনো ক্ষেত্রে পুরুষগণ সংস্কারক হউন-না কেন, গৃহসংস্কারে নারীর সাহায্য

নহিলে চলে না। ক্রিয়াকর্মে সংসারযাত্রায় অশনআসনে বসনভূষণে সর্বত্রই অযথা ব্যয়সংকোচ করিবার ক্ষমতা প্রধানত রমণীর হস্তে। সব দিক রক্ষা করিয়া যদি সাধ্যমত স্বল্পব্যয়ে সংসার চালাইতে পারি, তবেই আমরা সুশিক্ষিতা নামের যোগ্য। নচেৎ এ শিক্ষার আদর ক্রমশই কমিবে। ইংরিজিয়ানার প্রকোপে আমাদের চালচলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা নিজেকে না পারুন —চেষ্টা করিলে অন্তত ছেলেমেয়েদের এ রোগ হইতে এখনও কতক-পরিমাণে রক্ষা করিতে পারেন না কি? প্রথমে যাঁহারা জেতৃজাতির আচারব্যবহার নিবিচারে গ্রহণ করিয়াছেন, এখন তাঁহাদের বর্জন শিখিতে হইবে, বাছাই করিতে হইবে। সতর্ক ও দক্ষরূপে এই নির্বাচনকার্যে ব্রতী হইয়া, যাহাতে কোনোকালে একটি নব্যবঙ্গসমাজ গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, সেইদিকে শিক্ষিত মেয়েদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। বিলাসিতার আর-একটি দোষ এই যে, নিজের পক্ষে যাহা নিরীহ মনে হয়, অন্যের পক্ষে তাহাই অনিষ্টকর দৃষ্টান্ত হইতে পারে; সুতরাং মনে মনে একটা আদর্শ খাড়া করিয়া সেই অনুসারে চলিবার চেষ্টা করাই ভালো।

আমোদপ্রিয়তা সম্বন্ধে উপরোক্ত অনেক কথাই খাটে— যথা, কালভেদে পার্থক্যমাত্র নিজস্ব দলের অভ্যাসমধ্যে আবদ্ধ রাখিলে দোষ নাই, ইত্যাদি। আমাদের দেশের প্রথা যে অকালবিজ্ঞতা অনুমোদন করে, আমি তো তাহার পক্ষপাতী নহি। আমোদ-আহ্লাদ যদি নির্দোষ হয়, এবং কর্তব্যকর্মের ব্যাঘাত না ঘটায়, তাহা হইলে এই দুঃখের সংসারে তাহার প্রচলন তো সুখের বিষয়। একে তো আমাদের সাধারণ বাঙালি মেয়েদের নিশ্চিন্ত বাল্যজীবন নাই বলিলেই হয়। বালিকা-

বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই তাহারা বিবাহিতা ও অন্তঃপুরবদ্ধা ; কিশোরী না হইতেই মাতৃব্রতে দীক্ষিতা ও সংসারপাশে বিজড়িতা ; যুবতী না হইতেই হয়তো বৈধব্যে নির্বাণপ্রাপ্তা। তাহারা কি রক্তমাংসের জীব নহে? বিধাতা কি তাহাদের মানুষ করিয়া গড়েন নাই? আকাশ বাতাস আলো গাছপালা মানুষের মুখ, কাব্য ও সংগীতরসমাধুর্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহচর্য, অবসরের নিশ্চিন্ত আরাম— এ-সকলে কি তাহাদের কোনো অধিকার নাই? বাল্যের সরল আনন্দ, বার্ধক্যের স্নিগ্ধ বিশ্রাম কি তাহাদের পক্ষে আবশ্যক নহে? এই তো সুদীর্ঘ কর্মজীবন সম্মুখে প্রসারিত, তাহার মধ্যে কি সামান্য আমোদপ্রমোদও তাহাদের পক্ষে দূষণীয়? পূর্বেই বলিয়াছি যে, যাহার যেরূপ আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, তাহার কাজকর্ম আমোদপ্রমোদ তদনুরূপ হওয়া উচিত, এবং কার্যত হইয়াও থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে বিবাহবয়সের প্রসারণ অন্তঃপুরের দ্বার উদ্‌ঘাটন প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের প্রচলনজন্য সম্প্রতি বাঙালির মেয়ে কতকগুলি নূতন আমোদের অধিকারিণী হইয়াছেন বটে ; যথা, বায়ুসেবন, বায়ুপরিবর্তন, দেশভ্রমণ, বিনানুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ, সাহিত্যসংগীত-শিল্পকলার অনুশীলন বা রসাস্বাদন, ইত্যাদি। ইহার কোনোটি বা সবগুলিই অবস্থানুযায়ী মাত্রাপূর্বক ভোগ করিলে কোনো তো আপত্তির কারণ দেখি না। সর্বমত্যন্ত গর্হিতমের নিয়ম লঙ্ঘন না করিলেই হইল। ইহাতে যদি আপসোসের কোনো কারণ থাকে তাহা এই যে, সবগুলিই কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ, এবং যাঁহারা ইহাতে অভ্যস্ত তাঁহারা আমাদের দেশের অনাড়ম্বর সুলভ সরল আমোদপ্রমোদে সন্তুষ্ট হন না, এবং অনেকে সেকেলে সুন্দর শিল্পকলার আদর বা চর্চা করেন না, জানেন না। আবার বলি যে, সেকাল ও একালের সুসংগত সম্মিশ্রণসাধন আধুনিক মায়েদের

প্রধান কর্তব্য, এবং কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। ইংরাজি কথায় বলে —নরম ডাল যেদিকে নোয়াইবে গাছ সেইদিকেই ঝুঁকিবে। ধর্মকর্ম শিক্ষা-দীক্ষা রুচি ক্ষমতা আদর্শ— অধিকাংশই ছেলেবেলার অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, এবং সে অভ্যাস করাইয়া দেওয়া বিশেষরূপে মায়ের কাজ। তবে যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সকল বিষয় সুবিবেচনা-পূর্বক দিকনির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেইজন্যই তো যথার্থ সুশিক্ষার প্রয়োজন। এখনও এতদূর ভুলপথে অগ্রসর হই নাই আশা করি যে, ফিরিবার উপায় নাই।

ষষ্ঠ অভিযোগ পঞ্চমেই সূচিত হইয়াছে। স্বার্থপরতা এবং বিদেশীয়তা —এই দুই ভাগে তাহা বিভক্ত করা যায়। একেলে ইংরাজিশিক্ষিত মেয়েরা অপেক্ষাকৃত স্বার্থপর, তাহা মানিতে হইবে। পূর্বের ন্যায় সুবৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা হয়তো তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আগেই বলিয়াছি, বয়ঃপ্রাপ্তিতে বিবাহ ও পাশ্চাত্য-ভাবের প্রভাবে একটু নিজত্ব গঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বের ও পরের অবস্থা ঠিক সমান কখনও থাকিতে পারে না। যদি মনে করি স্ত্রীশিক্ষার কোনো সুফল আছে, তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্য দুই-একটি পরিবর্তন অসুবিধাজনক হইলেও গ্রাহ্য করিতে হইবে। 'গাছেরও পাড়ব, তলারও কুড়াব' এ দুই দিক রক্ষা হয় না। অনভিজ্ঞার সারল্য ও সম্পূর্ণ অধীনতা, এবং শিক্ষিতার মার্জিত জ্ঞানবুদ্ধি ও আত্ম-নির্ভরতা একাধারে আশা করা বৃথা। একটু নিজস্ব জীবনখণ্ড তাহাকে দিতেই হইবে। গহনাই একমাত্র স্ত্রীধন নহে। পূর্বের তুলনায় কম হইলেও আজও স্ত্রীলোককে নিতান্ত কম ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না, সে যে নারীর স্বধর্ম। আর, চতুর্দিকের অবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও

ঘটিবেই, তখন একমাত্র নারীকে ঠিক পূর্বস্থানে অবিচলিত রাখা অসম্ভব। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সে একান্নবর্তী পরিবার, সে সামাজিক বন্ধন এখন কই? সুতরাং নূতন তন্ত্রের সামাজিকতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরও কিঞ্চিৎ নূতন মূর্তি দেখিয়া আপত্তি করা অসংগত। বরং আশা করা যায় যে, বর্তমান অরাজকতার দিনে, যেমন অবস্থায় পড়িবে তাহার সহিত বনাইয়া লওয়া একমাত্র সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতীর পক্ষেই সম্ভব। সুপ্রতিষ্ঠিত প্রচলিত আচার অনুসরণ অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু ভাঙনের মুখে নিজেকে স্থির রাখিতে সুবুদ্ধির প্রয়োজন। তবে দেখিতে হইবে যেন সে বুদ্ধি সত্যই স্বাধীন হয়, কেবলমাত্র বিদেশীয়তার অন্ধ অনুকরণে পর্যবসিত নকল স্বাধীনতা না হয়। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে দেশের সহিত যথেষ্ট যোগ রাখা হয় না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এবং স্ত্রীশিক্ষার অনেক নিন্দার মূল কারণ। উচ্চতম শিক্ষাতেও এই দোষের ক্ষতিপূরণ হয় না। নিজের সন্তানকে যদি দেশের সুসন্তান করিতে না পারিলেন, তবে বঙ্গমাতার এমন সন্তানলালনে ফল কী? এবং তিনি নিজে যদি দুর্ভাগ্যবশত স্বদেশের সমাজ ধর্ম সাহিত্য আচার-ব্যবহার ও আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ হইয়া থাকেন, তবে সন্তানকে কিরূপে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত করিবেন? এ বিষয়ে স্কুলকলেজের ত্রুটি বাড়ির শিক্ষায় কতকপরিমাণ সংশোধিত হইতে পারে অবশ্য, কিন্তু অন্তঃপুরই যদি কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া থাকে? তাহার একমাত্র উপায় বোধ হয় ঠেকিয়া শেখা। এইপ্রকার দায়ে-পড়া শিক্ষা এখনই চতুর্দিকে আরম্ভ হইয়াছে; ইহা সুলক্ষণ। যতক্ষণ নিজের দোষ বুঝিবার ক্ষমতা আছে, তাহা খণ্ডনেরও আশা আছে। সাহেবিয়ানা বা বিবিয়ানা এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, তবে অধিকাংশ সময়ে

তাহার সহিত জড়িত থাকে বটে, কারণ আমাদের স্কুলকলেজমাত্রই ইংরাজি ভাব ও ভাষার পরিপোষক।

ইংরাজি-অভিজ্ঞা ও ইংরাজি-অনভিজ্ঞার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ অনিবার্য, কেননা ইংরাজি ভাষা আমাদের নিকট নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া দেয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সেজন্য ভিন্ন-শিক্ষিত স্ত্রীলোকের মেলামেশার তো কোনো বাধা দেখি না। কেবল আমার মনে হয়, যদি দুই দলের বেশভূষা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রমশ একই ধরনের করিয়া আনা যায়, তাহা হইলে মনের মিলেরও সাহায্য হয়। হিন্দুসমাজ যেরূপ উদারতা দেখাইতেছেন তাহাতে শীঘ্রই অনাবশ্যক বাহ্যিক স্বাতন্ত্র্যগুলি লোপ পাইবে মনে হয়। অবশ্য গতিশীল সমাজেরও মিলনের দিকে অগ্রসর হওয়া চাই। অর্থাৎ, বিদেশী চালচলনের গতি মন্দ করা চাই। বাঙালিরা যত শীঘ্র বাহিরের আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া ফেলে, এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। ফলে বাঙালির মেয়েরা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠশিক্ষিতা হইলেও অধিকমাত্রায় বিদেশী ভাবাপন্ন বলিয়া স্ত্রীশিক্ষার মর্যাদারক্ষণে অক্ষম হইয়াছেন, এবং অল্পদিনেই সে শিক্ষার বিরুদ্ধে স্বদেশীর মন ফিরাইয়াছেন।

কিন্তু আর কেন? ছয় রিপুতেই রক্ষা নাই, ছিদ্রান্বেষণেরও অন্ত নাই। এইবার দোষের তালিকা সমাপ্ত করিয়া গুণের ফর্দ ধরা যাউক। মধুরেণ সমাপয়েৎ। গুণের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, কেবল উল্লেখই যথেষ্ট। বোধ হয় দেখিব যে, ক্ষতিপূরণের নিয়মানুসারে প্রায় প্রত্যেক দোষেরই অপর পৃষ্ঠায় একটি গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তৌলের ভার জহুরীর হাতে।

১. বুদ্ধির উদারতা বা সাম্যভাব। অর্থাৎ ভালোমন্দ সত্যমিথ্যা

হিতাহিত যৌক্তিক অযৌক্তিক বুঝিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা। অন্ধ সংস্কার বা অভ্যাসের সম্পূর্ণ বশীভূত না হওয়া।

২. আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান। সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী বা অতিসংকুচিতা ভীতা না হওয়া। সকল তুচ্ছ সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাতে বিচলিত না হওয়া।

৩. সময়ের মূল্যবোধ বা নিয়মিতরূপে নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন। গৃহস্থালীতে সুশৃঙ্খলার চেষ্টা। রন্ধনাদি ছাড়াও অপরাপর শিল্পকর্মে মনোযোগ।

৪. বেশভূষা ও গৃহসজ্জায় অধিকতর পারিপাট্য। কেবলমাত্র শুচিতা নহে, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার দিকেও দৃষ্টি। আধুনিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান।

৫. গৃহ এবং পরিবারের বাহিরেও মনকে প্রসারিত করা, সকল-প্রকার সমাজে মিশিতে পারা, পৃথিবীর খোঁজখবর রাখা। সামাজিক উন্নতিচেষ্টায় যোগ দেওয়া।

৬. স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী বা সকল বিষয়ে তাঁহার সহকারী ও হিতকারী হইবার উপযোগিতা। নানা বিষয়ে একালের পরিবর্তনশীল সমাজের যোগ্য হওয়া। সন্তানের শিক্ষার সাহায্য করিবার ক্ষমতা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কঃ পন্থা? কোন্‌দিকে যাইব? কাশী বা মক্কা, কোনোটাই গম্যস্থান হইতে পারে না। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সেকেলে প্রাচ্যভাব বা সম্পূর্ণরূপে নব্য পাশ্চাত্যভাব, কোনোদিকেই যাওয়া সম্প্রতি সম্ভব বা বিহিত নহে। মধ্যপথ অবলম্বনই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়াই সর্বাপেক্ষা কঠিন। বলিতে সহজ বটে, করিতে তা নয়। পুরুষরা যেরূপ গড়িতে চাহিয়াছেন, চিরকাল মেয়েরা সেইরূপই গঠিত হইয়াছে।

তবে একটি স্বাভাবিক সংযমবশত মেয়েরা নূতন স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতে অনিচ্ছুক ও সাধ্যমত পুরাতনকে ধরিয়া থাকিতে সচেষ্ট। তাহাদের এই ভাবই সমাজের রক্ষাকবচ। ইহা বক্ষে ধারণ করিয়া তথাপি অগ্রসর হইতেই হইবে। সেই পথে পুরুষদের সহায়তা আবশ্যক। আমাদের দেশের মনীষীগণ বলিয়া দিন ভারতরমণী কোন্ পথে কী প্রণালীতে অগ্রসর হইলে সমাজের কল্যাণ হইবে? পুরাতনের কোন্ অংশগুলি বর্জনীয়, নূতনের কোন্ অংশগুলি বরণীয় এবং কিরূপে দুইয়ের সংগত সম্মিলন সম্ভব? সেকালে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না তাহা বলি না, কিন্তু সে শিক্ষা নানা কারণে এখন দুষ্প্রাপ্য। অথচ কোনোপ্রকার স্ত্রীশিক্ষা যে দিতেই হইবে, সে বিষয় বোধ হয় সকলে একমত। একেলে স্ত্রীশিক্ষার দোষগুলি সব অনিবার্য নহে, তাহা এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। একাধারে বাদী প্রতিবাদী কৌঁসুলী ও বিচারক হওয়ার দরুন সম্ভবত আমার লেখা ইচ্ছানুরূপ প্রাঞ্জল হয় নাই। তবু সাধ্যমত বিশ্লেষণ করিয়াছি, কারণ শত দোষ স্বীকার করিয়াও আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। ইহাতে পৃথিবীর কী উপকার বা অপকার হয় তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে অক্ষম হইলেও এইটুকু বলিতে পারি যে, সাহিত্য ও শিল্পকলা পুরুষের ন্যায় রমণীর পক্ষেও অতি সুখের সামগ্রী, অতি আদরের বস্তু। তাহা যে কত অবসরের নিশ্চিন্ত আরাম, কত নির্জনতার নিষ্কণ্টক সঙ্গী, কত নবরাজ্যের চিরোন্মুক্ত দ্বার, কত উচ্চাকাঙ্ক্ষার নীরব প্ররোচক, কত সুখদুঃখের মমতাপূর্ণ বন্ধু, কত মাধুর্যের অমৃত প্রস্রবণ, তাহা যিনি জানিয়াছেন, তিনি কেন না ইচ্ছা করিবেন যে, সকল নারীই সে সুধারস পান করুক। করিয়া তাহাদের নারীত্ব মধুরতর গভীরতর উচ্চতর উদারতর স্নিগ্ধতর হউক। যদি

না হয়, তাহা শিক্ষার দোষ নহে, শিখাইবার দোষ। আদর্শ ভিন্ন উন্নতি অসম্ভব। আমাদের বর্তমান ভাবুকগণ কবিগণ আমাদের বর্তমান কালের নূতন আদর্শ গড়িয়া দিন— যাহা সময়োপযোগী হইবে, দেশকালপাত্রোচিত হইবে; আমরা তাহাই অনুসরণ করিব, অন্তত চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রাচীন সমাজ যখন পরিবর্তিত হইয়া নূতন সমাজে পরিণত হইতেছে, তখন আদর্শ চাইই চাই— মেয়েদেরও চাই, পুরুষদেরও চাই, যাহার নাগাল পাইবার চেষ্টায় আমরা মানুষ হইতে পারি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, একেলে পুরুষরা একেলে মেয়েদের যতই দোষ ধরুন, তাঁহাদের বর্তমান সহধর্মিণীর পরিবর্তে যদি তাঁহাদের স্বর্গগত ঠাকুরমা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে সত্যই কি তাঁহারা সন্তুষ্ট হন?

শ্রাবণ ১৩১৯

সম্বন্ধ

আমার কোনো এক পূজনীয় আত্মীয় বলিতেন যে, মানুষ বিবাহপূর্বে দ্বিপদ, বিবাহান্তে চতুষ্পাদ এবং সন্তানাদি হইলে ষট্‌পদ হইতে ক্রমশ অষ্টপদ হইয়া অবশেষে মাকড়শার জালে জড়াইয়া পড়ে।

এক এক সময়ে আমার মনে হয় এই মাকড়শার সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে। আমরা সকলে তেমনি 'আপন রচিত জালে আপনি জড়িত', তেমনি সংসারবৃক্ষে সুখদুঃখের ছায়ালোকে দোদুল্যমান, তেমনি অদ্ভুত অধ্যবসায় ও নিপুণতার সহিত এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনজাল বুনিতে ব্যস্ত। সাদৃশ্য-তালিকা এইখানেই সমাপ্ত করিলাম, এবং আমরা অন্যান্য মানুষ-মাছিকে ঠিক তেমনি করিয়া নিজের জালের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া শুষিয়া খাইতে সর্বদা উৎসুক কি না, সে কথা উহ্য রাখিলাম। অন্তত সকলের সে বদ্ অভ্যাসটি নাই, ইহাই মনুষ্যজাতির সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ।

মাকড়শা কী কারণে জাল বিস্তার করে, তাহা পোকাতত্ত্ববিৎরাই বলিতে পারেন। কিন্তু আমার কল্পিত মানুষ-মাকড় অদৃশ্য তন্তুদ্বারা এইরূপে অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। সে যেন নিজে একটি কেন্দ্র, এবং নানা লোকের সঙ্গে নানা সূত্রে তাহার যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার জীবনজাল। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত -সারে আমরা জন্মাবধি এই জাল বুনিতেছি। শিশু ভূমিষ্ঠ না হইতেই তাহার কত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মৌমাছির চাক অথবা মাকড়শার জাল যেরূপ রেখাগণিতের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে গঠিত, মানুষের সমগ্র জীবনজাল তত সুনির্দিষ্ট না হউক, অন্তত তাহার গোড়া পূর্ব হইতেই বাঁধা থাকে।

যিনি অদৃষ্টবাদী, তিনি বলেন আমরণ সম্পূর্ণ নকশাই জন্মপূর্বে প্রস্তুত থাকে, আমাদের অঙ্গুলিচালনার ক্ষমতা আছে মাত্র। আবার যিনি পুরুষকারে বিশ্বাস করেন, তিনি বলেন ভালোমন্দ বুনানি আমাদের হাতে; উপকরণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমরা যন্ত্রী, যন্ত্র নহি। দৈবশক্তি যদি প্রবল হয়, তা হলে মানুষের জীবন য়ুরোপীয় লিখিত সংগীতের ন্যায় আগাগোড়া বিধিবদ্ধ, এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নির্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য, মানুষ উপলক্ষ বৈ নয়। আর আত্মশক্তিই যদি প্রবল হয়, তা হলে প্রতি জীবনের রাগিণী ও ঠাট আত্মাশক্তির হাতে বাঁধা হইলেও, তাহা আমাদের দেশের সংগীতের ন্যায় বহু বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাপূর্ণ, গায়কের ক্ষমতা ও ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত, এবং পুনঃপুনঃ পুনরারব্ধ।

সে যাহা হউক, আমার মাকড়শা অত তত্ত্বজ্ঞানের ধার ধারে না। তত্ত্বকথায় তাহার চতুর্দিকের বাতাস অনুরণিত বটে, কিন্তু তাহার এক কান সেদিকে থাকিলেও জালবোনা স্থগিত রাখিয়া সে-সব কথার মীমাংসা করিতে বসা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আমরা আজ আছি কাল নাই সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা চাই, এবং আশপাশের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাহার একমাত্র উপায়। পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়াকে সাধারণত বলে চুরি। কিন্তু যাহা-কিছু অপরকে দিতে পারিতাম, অথচ দিই নাই— সে-প্রকার চুরির জন্য স্বতন্ত্র ধারা ও কারা আবশ্যক নহে কি?

শৈশবকালে আমাদের দেনা অপেক্ষা পাওনার ভাগই বেশি। তখন আমরা গ্রহণ করিতেই ব্যস্ত, দান করিবার ক্ষমতা তখনও জন্মায় নাই। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন আলো-বাতাস খাদ্যপানীয় সবই আমাদের

শরীরমন গড়িয়া তুলিবে, তবে তো আমরা কিঞ্চিদপি প্রতিদান দিতে সমর্থ হইব। আগে আহরণ, পরে বিতরণ; আগে সংকোচন, পরে প্রসারণ। জ্ঞানোদ্‌গমের সঙ্গে সঙ্গেই চারি দিক হইতে 'দাও' 'দাও' রব উত্থিত হয়, এবং চিরজীবন সেই প্রার্থনা অল্পবিস্তর পূর্ণ করিতেই কাটিয়া যায়। পিতামাতা বলেন ভক্তি দাও, শিক্ষক বলেন মন দাও, প্রণয়ী বলে প্রেম দাও, বন্ধু বলে প্রীতি দাও, সমাজ বলে সৌজন্য দাও, দেশ বলে কাজ দাও, সুখী বলে হাসি দাও, দীনদুঃখী বলে করুণা দাও, সন্তান বলে স্নেহ দাও, পাওনাদার বলে টাকা দাও— অবশেষে মৃত্যু বলে প্রাণ দাও, না দিলেও প্রাণ কাড়িয়া লইয়া যায়। আর বুঝি বা ভগবান বলেন সব দাও।

মাকড়শা বেচারি কী করে, গোরু যেমন ঘানিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তেল জোগায়, সেও তেমনি অহরহ স্বীয় জীবনচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মর্মজাল ও কর্মজাল বুনিতে থাকে। মর্মই তো কর্মের প্ররোচক ও নিয়ন্তা, এবং কর্মস্রোত ও চিন্তাস্রোত বরাবর পাশাপাশি বহিয়া পরস্পরকে শোধন করিতেছে বলিয়াই মনুষ্যজীবনে ক্রমোন্নতির আশা করা যায়। কেহ কেহ আজকাল সত্যই বিশ্বাস করেন যে, কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রশ্মিদ্বারা মানুষ পরস্পরের উপর মানসিক প্রভাব বিস্তার করে, এবং কর্মযোগ অপেক্ষা নিগূঢ় যোগে একের চিন্তা অপরকে স্পর্শ করে। সে যোগ, চর্মচক্ষে না হউক, দিব্যচক্ষে দ্রষ্টব্য। অবশ্য এ স্থলে আমরা বহির্মুখী রশ্মির কথাই বলিতেছি, কিন্তু বলা বাহুল্য যে বাহির হইতে অন্তর্মুখী রশ্মিজালও ক্রমাগত আসিতেছে। এই আদানপ্রদান টানাপোড়েনেই তো জীবন-নকশা এত বিচিত্র, এবং কপাল ও হাতযশ অনুসারে এত সুন্দর হয়। নিজের সহিত নিজের পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইতে দূর

দূরতর দূরতম সম্বন্ধ পর্যন্ত গড়াইয়া ছড়াইয়া গাঢ়বর্ণ কেমন অলক্ষিতে ফিকা রঙে মিলাইয়া আসে, তাহা সহজেই পরিকল্পনা করা যায়। আত্মবৎ সম্বন্ধই প্রত্যেকের নিকট বেশি প্রকট, তাহা নিশ্চয়ই হৃদয়ের রক্ত-রাগে লাল। তার পরে যে যতদূর পৌঁছিতে পারে। গোড়া যেমন অহং-এ স্পষ্ট প্রোথিত, মাঝখান যেমন অসংখ্য চিত্রবিচিত্র নানামুখী সূত্রে গ্রথিত, শেষটা তেমনি কোন্ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহা অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট। প্রকৃতিভেদে সীমা কমবেশি স্পষ্ট। এমন সীমাবদ্ধ স্বার্থপর জীব বোধ হয় কেহ নাই, যাহার মন কোনো-না-কোনো সময়ে নিজের জীবন-কোটর হইতে অজানা অসীমে দূত না পাঠায়। আবার, এমন ক্ষণজন্মা পুরুষও আছেন যাঁহারা অহমিকার লাল হইতে শুরু করিয়া আত্মীয়তা সামাজিকতার গোলাপি আভার মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রেমের শেষ শ্বেত আলোক পর্যন্ত অটুটভাবে জীবনজাল বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যেখানে সাধারণ মানুষের মন দূরবীন না কষিয়া কিছু দেখিতেই পায় না, হৃদয়ঙ্গম করা তো দূরের কথা।

কিন্তু তন্তুজাল ও রশ্মিজালে মিলিয়া মিশিয়া উপমা ক্রমে ঘোরালো হইয়া পড়িতেছে, অথচ পূর্বেই বলিয়াছি আমার মাকড়শা সরলপ্রকৃতির সহজ লোক, অসাধারণ বড়োলোক বা ভাবুক নহে। শেষ পরিণাম ভাবিতে সে সময় নষ্ট করে না, কারণ তাহার অবসর কম ও কাজ অনেক। তাহার সাদা চোখের দৃষ্টি যতদূর যায়, সেই গণ্ডির মধ্যে আপনা হইতে যাহারা আসিয়া পড়ে, তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে ও রক্ষা করিতে পারিলেই সে যথালাভ মনে করে। সম্বন্ধের সংখ্যা বা দূরত্বের উপর মহত্ত্ব নির্ভর করে হয়তো, কিন্তু সামঞ্জস্যরক্ষার উপর সৌন্দর্য নির্ভর করে, সে কথা অন্তত স্ত্রীমাকড়শার মনে রাখা উচিত। আমার সময়ে সময়ে

নারীর উক্তি

মনে হয় আমরা পরের দেখাদেখি এই সম্বন্ধসূত্র অনর্থক বেশি লম্বা ও জটিল করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাকে একপ্রকার দীর্ঘসূত্রতা বলা যাইতে পারে। শিরা উপশিরা যত দূরে ছড়াইবে ততই হৃৎকেন্দ্র হইতে রক্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া শক্ত হইবে, এবং যেখানে মন দিতে পারিব না সেখানে শুধু শুষ্ক কাজ দিয়া কী ফল? এই হৃৎপদার্থের অভাবেই পৃথিবীর বড়ো বড়ো ধর্ম গোঁড়ামিতে ও বড়ো বড়ো কথা বাঁধিগতে ক্রমশ পরিণত হয়; এবং বারংবার পুনরাবৃত্তিতে জীর্ণ সংস্কারকে এই হৃদামৃতে সরস ও সতেজ করিবার নিমিত্তই যুগে যুগে মহাত্মার সম্ভাবনা আবশ্যক হয়। মৌচাকে যতক্ষণ মধু থাকে ততক্ষণই তাহার সার্থকতা, নহিলে সে রিক্ত পরিত্যক্ত নিরর্থক কোষমাত্র। সেকালে মেয়েদের কাছে অনাত্মীয় যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারাও আত্মীয়ের পাতানো সম্পর্ক ও স্নেহ লাভ করিতেন। এখন কি আমরা সেই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বদলে সভাসমিতির নীরস শাখাপ্রশাখা বিস্তার করা শ্রেয় মনে করিব? চিঠির সঙ্গে টেলিগ্রামের যে তফাত, ব্যক্তিগত ও সমিতিগত সম্বন্ধে সেই তফাত। একটি সরস সজীব ও স্বপ্রকাশ, আর-একটি শুষ্ক কঙ্কালসার ও কাজের নির্বাহক কিন্তু ভাবের হন্তারক। আজকাল হয়তো আমরা পাড়াপ্রতিবেশীর বিপদে-আপদে খোঁজ লই না, অথচ আফ্রিকার দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর হওয়া উন্নতির লক্ষণ মনে করি। মেয়েদের সংকীর্ণ পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে তাহা বলি না, কিন্তু মেয়েপুরুষ উভয়েরই উচিত নিকট হইতে দূরের সব পথটুকু মাড়াইয়া চলা, ডিঙাইয়া যাওয়া নয়। পুত্রকে ত্যাজ্য করিয়া পৌত্রের জন্য প্রাণ দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। কেবলমাত্র একটি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলে বাতাস দূষিত হয় বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেলুনে

উড়িবার দরকার দেখি না, জানালা খোলা রাখিলে এবং মধ্যে মধ্যে বায়ুপরিবর্তন করিলেই যথেষ্ট। তেমনি অতিসংকীর্ণতা জীবনমনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বলিয়া, অতিপ্রসারতাও কিছু অনুকূল নহে। এই ঘর ও পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা আজকালকার দিনের একটি প্রধান সমস্যা। কেননা, পূর্বাপেক্ষা পরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে, অথচ সেই কারণেই মন বিক্ষিপ্ত এবং জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া সাবধান থাকা আবশ্যক। প্রত্যেকের হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতার একটি স্বাভাবিক সীমানা আছে, সেটি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিলে অনর্থক বলক্ষয় হয়। অবশ্য সেই সীমানা অগ্রসর করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত, নহিলে জড়তার অন্ধকূপে পড়িবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু হৃদয় যাহাতে পিছাইয়া না পড়ে, হাত বাড়াইবার সময় সেদিকে যেন লক্ষ্য থাকে। জীবনযাত্রাও একটি শোভাযাত্রা হইতে পারে, যদি আমরা তাহার শিল্পচাতুর্য আয়ত্ত করিতে পারি— এবং এই শিল্পকার্যের মতো মহৎ ও সুন্দর শিল্প আর নাই। বাঙালি পুরুষে যদি সেই মধুচক্র রচনা করিতে পারেন, 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'; এবং বাঙালি স্ত্রীলোকে যদি 'পৌরজন'কে সেই আনন্দ বিতরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের জীবন যথেষ্ট সার্থক হয়। পুরুষরা অবশ্য সংসারের অনেক নীরস কাজ করিতে বাধ্য, কাহারো না কাহারো তো করিতেই হইবে। কিন্তু তাঁহাদেরও জীবনের সুযাত্রার পক্ষে অবসর আবশ্যক, এবং মেয়েদের পক্ষে তো নিতান্তই আবশ্যক, কারণ অবকাশেই সেই-সকল ফুল ফোটে, যাহাতে সংসার মরুময় না হইয়া কখনও কখনও 'নন্দনগন্ধমোদিত' হয়; অবকাশই

সেই রন্ধ্র, যাহার মধ্য দিয়া 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর'।

মানুষের সহিত মানুষের যেমন দেনাপাওনার সম্বন্ধ, মনুষ্যেতর প্রকৃতির সহিতও কি তাহাই? প্রকৃতির নিকট হইতে আমরা যেন শুধু পাই মনে হয়, প্রতিদানে কিছু দিই না। শিশিরসিক্ত স্নিগ্ধ উষায়, রৌদ্ররঞ্জিত উদাস দিবসে, সূর্যাস্তমণ্ডিত স্বর্ণসন্ধ্যায়, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজতনিশীথে যখন আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য পান করি, তখন কি কিছু দান করি? না, মনের তন্ত্রীরাজির উপর সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অবাধ হস্ত-সঞ্চালন নীরবে অনুভব করি মাত্র! যিনি নীরব থাকিতে না পারেন, তিনি প্রকাশের প্রকার অনুসারে কবি বা শিল্পী হন, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতিকে কিছু প্রতিদান করা হয় কি না সন্দেহ, সময়ে সময়ে প্রতিশোধ লওয়া হয় বটে। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ' রীতিমত বিচার করিতে না বসিয়াও বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের সৌন্দর্যের সহিত আমাদের হৃদয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই শিল্পকলা, তাহার কার্যকারণ-শৃঙ্খলার সহিত আমাদের বুদ্ধির যে সম্বন্ধ তাহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানদর্শন, এবং তাহার দ্বারা উদ্দেশ্যসাধনের সহিত আমাদের দ্বারা নির্ধারিত উপায়ের যে সম্বন্ধ তাহাই আজকালকার বহুমান্য efficiency বা কার্যকুশলতা।

মনুষ্যনির্মিত বস্তুতেও গঠনের সহিত উদ্দেশ্যের একটি সম্বন্ধ আছে, সেটি যথাযথ রক্ষা করিতে না পারিলেই সৌন্দর্যচ্যুতি ঘটে। অবশ্য প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্যসাধনের কৌশলে যত সিদ্ধহস্ত, আমরা তাহার তুলনায় আনাড়ি মাত্র, তবু যে শিল্পী যত গুণী তিনি তত লক্ষ্যভেদে পটু, এবং সত্যের সহিত সুন্দরের মিলনসাধনে সমর্থ। হিসাব করিয়া দেখিতে

গেলে জগতের সৌন্দর্যভাণ্ডারে মানুষ কিছু কম দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করে নাই— যাহা যুগে যুগে প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি এবং মানবের আনন্দবর্ধন করিয়াছে ও করিতেছে। স্থাপত্যবিদ্যা ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক-একটি পুরাতন শহরের ইতিহাসে কি মাহাত্ম্য কম? আবার এক-একটি বিখ্যাত ইমারতের মর্যাদার তো সীমা-পরিসীমা নাই। তাজমহল না থাকিলে আজ আগ্রাকে কে পুছিত? মানুষ যথার্থই প্রকৃতিকে বলিতে পারে 'আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা— তুমি আমারই'। যমুনার গৌরবের কতখানি প্রকৃতিরচিত এবং কতখানি কবিপ্রক্ষিপ্ত, তাহা অতিবড়ো রাসায়নিকও আজ নির্ণয় করিতে পারেন কি না সন্দেহ। তবু আমরা প্রকৃতির নিকট চিরঋণী, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ স্থলবিশেষে যেমন তাহাকে সাজাইয়াছি, তেমনি অসংখ্য স্থলে টিনের ছাদ ও কলের ধোঁয়া প্রভৃতিতে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করিয়াছি। পক্ষান্তরে, তাহার রূপরস যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, পোষণ করে, তাহার বজ্র তাহার সমুদ্র তেমনই আমাদের দগ্ধ করে, শোষণ করে। অতএব শোধবোধ।

স্ত্রীলোক ও পুরুষের দেবদত্ত অনৈক্যের মধ্যে এই একটি প্রধান যে, স্ত্রীলোক নিকটের সঙ্গে এবং পুরুষ দূরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে স্বভাবত পটু। কারণ পুরুষ সৃষ্টিকর্তা, স্ত্রীলোক রক্ষাকর্তা (এবং বালক প্রলয়কর্তা!); যিনি রক্ষক তিনি গচ্ছিত দ্রব্য হইতে বেশি দূরে গেলে চলে না। গৃহ এবং সমাজই নারীর নিকট গচ্ছিত সেই ধন, সুতরাং নারী তাহাই লইয়া পড়িয়া আছে ও পাহারা দিতেছে। তাহার শরীর ও মন, বুদ্ধি ও হৃদয় সবই ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে সর্বদা নিযুক্ত, সুতরাং বাহিরের প্রতি তাহার লক্ষ করিবার প্রবৃত্তি ও অবসর স্বভাবতই কম।

নারীর উক্তি

সব কাজ একের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে, কার্যবিভক্তিতেই কার্যসিদ্ধি। লক্ষ্য উচ্চ হইলে তাহার সাধনে কোনো খণ্ড কাজই তুচ্ছ নহে। গৃহরচনা ব্যূহরচনা অপেক্ষা কিছুমাত্র সহজসাধ্য নহে, এবং জীবন-সংগ্রামের পক্ষে বোধ হয় বেশি বৈ কম প্রয়োজনীয় নহে। খাদ্য যেমন পুরুষে অর্জন এবং স্ত্রীলোকে বণ্টন করে, তেমনি মানসিক খোরাকও পুরুষকেই অধিকাংশ জোগাইতে হয়। সত্যরাজ্যের সীমানা বাড়ানো তাঁহাদের কাজ, কিন্তু যে সত্যরত্ন মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা ও জীবনে প্রকাশ করা স্ত্রীলোকের কাজ। সেইজন্য সব দেশে ও কালে স্ত্রীলোক রক্ষণশীল, পুরুষ গতিশীল। একজনের সংকীর্ণ সামাজিক জীবন, অপরের বিস্তীর্ণ জাতীয় জীবন লইয়া কারবার। প্রাত্যহিক এবং প্রত্যক্ষ উপস্থিত জীবনযাত্রা-নির্বাহের ভার অধিকাংশ নারী অনুগ্রহ করিয়া (অথবা দায়ে পড়িয়া!) লইয়াছে বলিয়াই এতগুলি পুরুষ অপ্রত্যক্ষ এবং অনুপস্থিতের প্রতি এতটা মন দিতে পারে। তাই নারী মুক্তিদায়িনী। সে সর্বদাই দশচক্রে ঘূর্ণমানা ও দশভুজে কর্মনিরতা, তাই নারী শক্তিরূপিনী। সে পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবার জন্য সততই উন্মুখ ও প্রস্তুত। তাই নারী সন্তাপহারিণী। আর পুরুষ 'ভাঙ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ'— অন্নের ভিখারী, প্রেমের ভিখারী, সৌন্দর্যের ভিখারী, জ্ঞানের ভিখারী। আবার যখন ভিখারী নন তখন শিকারী, পশুপতি কি পশুমতি তাহা বলা কঠিন। সেই মৃগয়ামদে এখন য়ুরোপ মত্ত ত্রস্ত বিধ্বস্তপ্রায়। এই খাদ্যখাদক সম্বন্ধের তুলনা দিতে মাকড়শা হার মানে। হয় হিংস্রতর জন্তুর অবতারণা করিতে হয়, নাহয় স্বীকার করিতে হয় যে ভগবানের সৃষ্টিতে মানুষ হিংস্র জন্তু হিসাবে অদ্বিতীয়। সৃষ্টির কী উদ্দেশ্য তাহা ভগবানই জানেন, আমরা সে

হেঁয়ালির উত্তর দিতে ক্রমাগত চেষ্টা করি, এবং ক্রমাগতই ভুল করি— তাহা সংশোধনপূর্বক পুনরায় চেষ্টা করি, ও পুনরায় ভুল করি। এই চেষ্টা-পরম্পরায় ক্রমোন্নতি বা জীবের অভিব্যক্তি। এই নৃসিংহ-অবতারকে মানুষ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে কত যুগে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা এই বিংশ শতাব্দীর হত্যাকাণ্ড দেখিলে মনে হয় অনুমানেরও অগোচর। ইতিমধ্যে এটুকু নিশ্চিত যে, এই খাদ্যখাদক সম্বন্ধকে বাধ্যবাধক সম্বন্ধে পরিণত করিবার যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা স্ত্রীলোকেরই আছে। সেই দূরাৎসুদূর লক্ষ্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আপাতত প্রত্যেকে সযত্নে আপনাপন জীবনজাল বুনিতে থাকি। কাল পূর্ণ হইলে হয়তো এই ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম জালিসমষ্টিই বেড়াজালে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে আত্মীয়তার মঙ্গল রাখীবন্ধনে বাঁধিবে। তথাস্তু।

বৈশাখ ১৩২২

আদর্শ

সেকালের মেয়ের সহিত একালের মেয়েদের তুলনায় সমালোচনা অনেকবার হইয়া গিয়াছে, সে চর্বিতচর্বণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যতই ইচ্ছা এবং চেষ্টা করি-না কেন, ঠিক সেই ছাঁচে নিজেদের ফের ঢালাই করা, সেই সংস্করণ অক্ষরে অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত করা এখন অসম্ভব, ইহা নিশ্চিত। কারণ অধিকাংশ লোকই চারি পাশের চাপে গড়িয়া ওঠে, এবং সমাজ সেই চাপ দিবার যন্ত্রবিশেষ। এক-এক সময় এই সামাজিক চাপে মেয়েদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কিন্তু স্বভাব কিংবা শিক্ষার গুণে কিংবা দোষে অধিকাংশ স্থলে তাহারা চীন-রমণীর পায়ের ন্যায় সেই চাপ অনুসারে নিজেদের গড়িয়া লয়— এমন-কি, একটু ঢিলা পড়িলে অস্বস্তি বোধ করে, অভ্যাসের এমনি মহিমা। কোনো শংকরমহারাজের এক কলমের টানে, এক পরোয়ানার জোরে যদি একদিনে বাংলাদেশে অবরোধপ্রথা রহিত হইয়া যায় (হায় রে দুরাশা!) তা হলে বাঙালির মেয়ে কি প্রথমে সত্য সত্যই সন্তুষ্ট হয়? যেমন 'স্বভাব ম'লেও যায় না' তেমনি স্বাধীনতাও পাইলেই লওয়া যায় না— তাহার মূল্য বুঝিতে পারা, তাহার সদ্‌ব্যবহার করিতে পারার জন্য আগে শিক্ষা দরকার; এবং সে শিক্ষার জন্য সময় দরকার। তবে সামাজিক মন বলিয়া যদি কোনো পদার্থ থাকে, তাহা অজ্ঞাতসারেও শ্রেয়ঃপথে চলিবে, ইহাই আমাদের আশা ও প্রার্থনা। আমরা চাই— যতই অন্ধ ও দুর্বলভাবে হউক-না কেন, তবুও আমরা চাই যে, যাহা সত্য তাহাই ধরি, যাহা ভালো তাহাই করি, যাহা সুন্দর তাহাই গড়ি। 'সেকাল গেছে বইয়া', আর ফিরিবে না। এখন একালে কঃ পন্থা— তাহাই জিজ্ঞাস্য।

আদর্শ

আমাদের দেশে এত বিভিন্নপ্রকার লোকাচার প্রচলিত আছে যে, মনে হয়, যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে। এখানকার প্রকৃতিও যেমন বহুরূপী, সম্প্রদায়ও তেমনি অসংখ্য, রীতিনীতিও তেমনি জটিল। আমাদের অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া, না পাওয়া যায় হেন মত নাই; আমাদের বিপুল দেশে অনুসন্ধান করিলে, না মেলে হেন প্রথা নাই। কোনো একটি ইংরাজ রাজপুরুষ বলিয়াছেন নাকি, যে ভারতবর্ষে পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সভ্যতার সকল স্তরই বিদ্যমান। কথাটি লাখ কথার এক কথা। কৌলীন্য ও ব্রহ্মচর্য, নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতা, হিঁদুয়ানি ও ম্লেচ্ছপনা, অহিংসা ও নরবলি, সাহেবিয়ানা ও স্বদেশীয়ানা, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী ভাব, মত ও আচার কিরূপে এমন নির্বিবাদে এক দেশে, এক কালে, এক সম্প্রদায়ে, এমন-কি, এক গৃহতলে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বাস করিতে পারে, তাহা বিদেশী বুঝিবে কি, আমাদেরই বুঝিয়া ওঠা ভার।

তবে কি আমাদের দেশ এক নহে, আমরা এক জাতি নহি? অতীতে কী ছিল ঠিক বলিতে পারি না— সম্পূর্ণ 'স্বরাজ' না থাকুক, অন্তত 'স্ব স্ব রাজ' ছিল বোধ হয়। কিন্তু আচারে আজকাল আমরা যেমন সংকীর্ণ, মত ও বিশ্বাসে তেমনি চিরকালই আমরা কিছু অতিরিক্ত উদার। আমাদের দোষও তাই, আমাদের গুণও তাই। ভারতমাতা নির্বিচারে সকল দেশের সকল কালের ধর্মকর্মকে নিজের অঙ্কে স্থান দিয়াছেন— গ্রহণ পালন ও রক্ষা করিয়াছেন, কোনো অতিথিকে ফিরান নাই।

কিন্তু জাতিগঠন করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট কিছু হওয়া চাই। মানুষ স্বভাবত সর্বজনীন জীব নহে— আগে বিশেষ দেশের বিশেষ

কালের মানুষ হইয়া সে জন্মায়, তাহার পর সাধনার ফলে বিশ্বমানবের অংশীদার হইয়া উঠিলে তবে তাহাকে মানায়। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য হইতে ক্রমে পরমাত্মার সাযুজ্যে পৌঁছিতে পারিলে তবে তো সুখ, নহিলে সাকার নিরাকারের কোনো অর্থই থাকে না, সবই একাকার। সেই বিশিষ্ট আকারটি আমাদের নিজের জাতকে দিবার সময় আসিয়াছে— এখন যেন সৃজনের পূর্বে নীহারিকার ন্যায় আমাদের অবস্থা।

নিরাকার উপদেশ অপেক্ষা সাকার দৃষ্টান্ত ভালো। ছেলেবয়স হইতে বুড়াবয়স পর্যন্ত অনেকপ্রকার পরিবর্তনের মধ্যেও তো প্রত্যেক মানুষের ভিতরকার ঐক্য বজায় থাকে, নষ্ট হয় না। সেইরূপ আমাদের আপাতদৃষ্ট বৈচিত্র্য এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যে এক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাকে নবকলেবর ধারণ করাইতে হইবে।

হিন্দু জাতির মুশকিল এই যে, তাহার সেই সূক্ষ্মশরীর এতই সূক্ষ্ম যে, মনশ্চক্ষেও ধরা কঠিন। হিন্দুত্বের প্রাণ কিসে এবং কোথায়, সে সম্বন্ধে এলাহাবাদের এক কাগজ কিছুকাল পূর্বে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, তাহার বিভিন্ন উত্তর হইতে এই বিষয়ের দুরূহতা প্রতিপন্ন হইবে।

কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে কিংবা বুঝাইতে না পারিলেও আমরা মনে মনে জানি আমরা এক। কেবল ইংরাজরাজের সূত্রপাত হইতে আচম্‌কা নানা নূতন ভাবের ও কাজের প্রেরণায় এবং তাড়নায় আমাদের স্বাভাবিক পরিণতি এত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, সব দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন। সময়ে যে ঐক্যবিধান করে তাহা মানানসহি হয়, কিন্তু সুবিধার খাতিরে রাতারাতি জোরজবরদস্তি করিয়া যে বাহ্য ঐক্যসাধন করিতে হয়, তাহা প্রায়ই সৌষ্ঠবহীন।

আদর্শ

আমাদের চিরনিদ্রিত দেশ-কুম্ভকর্ণের ঘুম যে সম্প্রতি ভাঙিয়াছে এবং তাহার অর্ধাঙ্গিনী ভারত-ললনাও যে জাগিয়াছে, তাহার প্রমাণ সর্বদা ও সর্বথা পাওয়া যাইতেছে। এখনই সুসময়। 'সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই' কালে, এ কথা আমাদের সকলেরই মনে করা উচিত, অন্তত যাহাদের 'এই দেশে'র জন্য কিছু করিবার কিছুমাত্র অভিপ্রায় আছে। বর্তমান কালপুরুষের নিশ্বাস বেগে পড়িতেছে, তাহার রক্ত জোরে বহিতেছে, তাহার নাড়ীর গতি চঞ্চল। এই সুযোগে যিনি যাহা করিবেন তাহার ফল হইবার যত সম্ভাবনা, ও প্রত্যেকের হাতে জাতিগঠনে সহায়তা করিবার যত ক্ষমতা দেখা যায়, এমন দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশকালে বিরল।

কিন্তু এ সময়ে অবিবেচনার ফলও সেই পরিমাণ মন্দ হইবার সম্ভাবনা, তাই সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন প্রথম ধাক্কা সামলাইয়াছি। ভালোই হউক, মন্দই হউক, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমাজসংস্কারের যে স্তরে আমাদের তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেখান হইতে আমরা চারিধার দেখিবার বুঝিবার ও যাচাই করিয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছি। এই মৃৎপ্রদীপের দেশে এতদিনে বৈলাতিক ভাবের বৈদ্যুত-আলো চোখে সহিয়া গিয়াছে, এখন আর অন্ধভাবে কাজ করিবার অজুহাত নাই। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বলিবার কাল গিয়াছে। এখন 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

সেই সদ্‌গুরু আমাদের উপদেশ দিন, একালের বাঙালি মেয়ে কোন্ আদর্শ শিরোধার্যপূর্বক জীবনপথে অগ্রসর হইবে? সীতা-সাবিত্রীর কথা তুলিবেন না। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। তাঁহারা চিরকালই আমাদের চিত্তাকাশে তারার ন্যায় জল্‌জল্ করিবেন, কিন্তু তারার

আলোয় জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। ওদিকে পশ্চিম-সমুদ্র-পারে নানা-প্রকার নর-নারীদলের বিদ্রোহ-রণযাত্রার রক্তবর্ণ মশালের আলো আমাদের নবজাগ্রত চক্ষু ও চিত্তে ধাঁধা লাগাইতেছে। সেই বিদেশিনীকে 'তোমারে সঁপেছি প্রাণ' বলিয়া আমরা কেহ কেহ তাহার পায়ে সর্বস্ব ঢালিয়া দিতেছি, কিন্তু সত্যই কি আমরা তাহাকে 'চিনি গো চিনি তোমারে' বলিতে পারি? এই তারা ও মশালের আলোর মধ্যবর্তী স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্থিরজ্যোতি সন্ধ্যাপ্রদীপ কে জ্বালিয়া দিবে?

আমরা দৈনিক জীবনের সহযাত্রী চাহি, যিনি আমাদের সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধা বুঝিবেন, আমাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করিবেন, অথচ যিনি আমাদের কাজে কর্মে, গৃহে সমাজে, আচারে অনুষ্ঠানে, ভাবে ভাষায়, চালচলনে অধিনেত্রী হইবেন; কোনো একজন বিশেষ দেবী বা মানবী নহেন, কিন্তু বহুকালের বহু লোকের সাময়িক আত্মপ্রকাশ— শুধু কথার সমষ্টি নহে, কিন্তু এখনকার আদর্শ বঙ্গরমণীর সুস্পষ্ট ধ্যানমূর্তি।

আমরা আধুনিক বঙ্গনারী 'কী করব, কী বেশ ধরব', কী প্রকার গৃহস্থালী, কিরূপ সামাজিক আচরণ অবলম্বন করিব, যাহাতে কালে একটি সুশোভন সুসংগত সুশৃঙ্খল নব্যবঙ্গসমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে— যে সমাজ গতকালের সহিত যোগ ত্যাগ না করিয়াও অনাগতকালের প্রতি মনোযোগ করিবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের দোষ বর্জনপূর্বক গুণের মিলন সাধিতে হইবে, সে কথা 'বলিতে সহজ বটে, করিতে তা নয়'। কী প্রণালীতে, কোন্ পরিমাণে, কোন্ মসলা বা দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়, তাহার উপরেই আহার্যের তার এবং ঔষধের গুণ নির্ভর করে। অযথা মাত্রায় অমৃতও বিষে পরিণত হয়। আপাতত আমরা অধিকাংশ লোক অন্তরে ও বাহিরে— বিশেষত বাহিরে, যে-ভাবে পূর্ব-পশ্চিম

মিলাইয়াছি, তাহাতে দুইয়ের একত্রীকরণ হইয়াছে মাত্র, একীকরণ হয় নাই। এই রাসায়নিক মিলনটি যদি আমরা ঘটাইতে পারি, তা হলে আমাদের মেয়েরা তাহার সুফল ভোগ করিবে। দুই নৌকায় পা দিয়া টলমল করিবার বিপদ হইতে যেন তাহাদের উদ্ধার করিয়া যাইতে পারি।

এ-সকল বিষয়ে এত মতভেদ ও গোলযোগের কারণ এই যে, চিন্তা ও কার্য পাশাপাশি চলিলেও সমান পদবিক্ষেপে চলে না। এ যেন ধীরগামী বৃদ্ধের সহিত চঞ্চল বালকের বিচরণ। বৃদ্ধ শান্তদান্ত সমাহিত-চিত্তে, নতনেত্রে, অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সমভাবে চলিয়াছেন, ভূত-ভবিষ্যতের ছবি মনোমধ্যে বায়োস্কোপের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া যাইতেছে, বর্তমানের সহিত যোগসূত্রস্বরূপ বালকটির লীলাখেলা দেখিয়া মাঝে মাঝে হাসিতেছেন, কখনও কখনও তাহার সরল চতুর প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, আবার মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন; বালকটি হাস্যোজ্জ্বল মুখে চারি দিকে চাহিতে চাহিতে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় গুরুগম্ভীরভাবে চলা কি তাহার পোষায়? সে কখনও লাফায়, কখনও প্রজাপতির পিছনে ছোটে, কখনও পথপার্শ্বে ফুল কুড়ায়, কখনও অকারণ-আনন্দে দৌড়িয়া অগ্রসর হয়, আবার দৌড়িয়া পিছাইয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরে, তাঁহাকে অসংখ্য অসম্ভব প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তোলে, এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনার কথা সাত-কাহন করিয়া বকিয়া যায়। অথচ দুইজনেরই পরস্পরকে নহিলে চলে না। এই জুড়িই জীবনশকটের বাহন, তাই আমাদের এমন অপূর্ব তরঙ্গায়িত গতি।

চিন্তাশীল ভাবুক লোক যতক্ষণ কথায় বা লেখায় তাঁহার বিচারের ফল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এদিকে ততক্ষণ তাঁহার নিজেরই

সংসারের কাজ সেই মতামতের পরিণতি অপেক্ষায় বদ্ধ থাকিতে পারে না— যেনতেন প্রকারে তাঁহাকে চলিতে এবং চালাইতে হইবেই। সেইজন্য আমাদের কথায় ও কাজে এত গরমিল, আমাদের জীবনে ও মনে এত অসংগতি পদে পদে দৃষ্ট হয়। কর্ম প্রথমে ঝোঁকের মাথায় হয়তো বিপথে চলিতে থাকে, তার পর চিন্তা যখন তাহার নাগাল পায় তখন তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়া গতিবেগ মন্দ করাইয়া কিছুদূর ফিরাইয়া আনে— আবার সে এগাইয়া যায়, আবার চিন্তার আকর্ষণে পিছু হটে। সেইজন্য জীবনের গতিরেখা সরল নহে, ঐ প্রকার কুটিল— অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ করিতে করিতে তবে সে অগ্রসর হয়— যেমন সেই বালক পিছাইয়া আসিয়া আবার বৃদ্ধের সঙ্গ ধরে।

ঋষিগণ ধর্মের পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় কহিয়াছেন, কিন্তু কর্মের পথ যে কতকপরিমাণ করাতের ন্যায়, সে তথ্য তাঁহারা জানিতেন কি না কে জানে। সকল কাজই যদি বিবেচনাপূর্বক করিতে হইত, তা হলে বোধ হয় মানুষ এক পাও এদিক-ওদিক নড়িতে পারিত না, স্থাণু হইয়া থাকিত। চিরাগত সংস্কার ও সামাজিক প্রথা এই সংকট হইতে আমাদের পরিত্রাণ করে। সুতরাং সেগুলিকে হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া কিছু নয়। আর সেগুলির পিছনেও আমাদের পূর্বপুরুষের চিন্তা রহিয়াছে, সেগুলি কিছু আকাশ হইতে পড়ে নাই। কর্ম যখন চিন্তাকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, তখন এই পূর্ব-সংস্কারই তাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করে ও ধাত্রীর ন্যায় নূতন চিন্তা-সমাগমের অপেক্ষা করে। সেকালের হিন্দুগণ সকল বিষয়েরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া তবে ছাড়িতেন, এ স্থলেও তাঁহারা চিন্তায় অতি স্বাধীনতা এবং কর্মে অতি অধীনতা স্বীকার করিয়া এই বৈষম্যের মীমাংসা করিয়াছেন।

কিন্তু আজকাল জ্ঞাতসারে মতে ও কাজে অত তফাত করা আমাদের মনঃপূত নহে। সম্পূর্ণরূপে না পারিলেও অন্তত কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করিবার চেষ্টাও তো করা উচিত? তাই বলি, সেকালের জীবনযাত্রার যতই সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য থাক্-না কেন একালে আমরা তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিব না, কারণ আমরা আজকাল তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি না, সে সরল নির্ভরের ভাব হারাইয়াছি। তখন ছিল পূর্বানুবৃত্তির কাল, বাধ্যতার কাল; এখন হইয়াছে পরীক্ষার কাল, স্বাধীনতার কাল। যস্মিন কালে যদাচারঃ। এখন পৃথিবীময় স্বাধীনতার হাওয়া বহিতেছে, কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে নারাজ। 'পড়ে এই কলির ফেরে সবি যে রে ভেঙে চুরে ভেসে যায়।' এই ভাঙনের দিনে, উচ্ছৃঙ্খলতার মুখে, আমরা মেয়েরা যদি একটু মাথাঠাণ্ডাভাবে হাল ধরিতে না পারি, তা হলে সংসারতরী যে কোন্ রসাতলে তলাইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই।

পরিবর্তনের কালে অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী। মনে করিলেই সর্বাঙ্গসুন্দর নব্য বঙ্গসমাজ অহিরাবণের ন্যায় বর্মচর্মসমাবৃত যোদ্ধবেশে অবতীর্ণ হইবে না। যিনি এই-সকল বিপরীত ভাব মত এবং আচারের কথঞ্চিৎ 'সমন্বয়'সাধন করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই জানেন সে কাজ কত দুঃসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নহে, যদি আমরা সকলে মিলিয়া চেষ্টা করি। স্রোতে গা ভাসাইয়া না দিয়া কেহ কোনো বিষয়ে যুগোপযোগী অনুষ্ঠানের ইচ্ছা বা চেষ্টার কোনো পরিচয় দিতেছেন দেখিলেও আনন্দ বোধ হয়। পরদেশী সঁইয়ার গলায় মাল্যদান যখন কপালে লেখা আছেই, তখন নিজে জাতিভ্রষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কিরূপে জাতে তুলিয়া লওয়া যায়, ইহাই সমস্যা।

নারীর উক্তি

পূর্বেই বলিয়াছি কাজ করে সকলেই, কিন্তু ভাবে দুই-চারি জন মাত্র। অথচ এই ভাবনাই কার্যসিদ্ধির উপায়। চিন্তা ও কর্ম পরস্পর-আশ্রিত, —যেমন বুদ্ধি ও হৃদয়, দক্ষিণহস্ত ও বামহস্ত। কামার কুমোর ছুতার প্রভৃতি যেমন আমাদের ভবের হাটের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে, ভাবুক লোক ও চিন্তাশীল লেখক তেমনি আমাদের ভবলীলার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধন করেন। কিন্তু তাঁহাদের বাণীর জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখার ভার আমাদের হাতে। অনেকে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়াও স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে, কিন্তু শেষরক্ষা হয় কি না সন্দেহ।

বাঁচিয়া থাকিতে গেলে যখন শিখিতেই হইবে, তখন 'ঠেকে শেখা' অপেক্ষা 'দেখে শেখা' ভালো। যাহারা হাটে কেনাবেচা করিয়াই দিন কাটায়, তাহাদের হয়তো ভাবের কথা কহিবার বা শুনিবার অবসর থাকে না, সব সময় দরকারও বোধ হয় না। কিন্তু মেয়েদের প্রধান কর্মই গার্হস্থ্যধর্ম, সেই ধর্মপালনের সহায়স্বরূপ ভাবের আদর্শ স্পষ্টরূপে মনে অঙ্কিত হওয়া চাই— জীবনের ভার বহিবে, সংসারের ঝঞ্ঝা সহিবে, এরূপ দৃঢ় অটল আশ্রয় অন্তরে সঞ্চিত থাকা চাই। শক্ত কাম্বিসের ছবি আপনি দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু নরম কাগজের ছবি না বাঁধাইলে লুটাইয়া গুটাইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

'বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি' অপরূপ রূপে মাতৃমূর্তি বাহির হইবেন জানি না; কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা তাঁহার একটা কাল্পনিক ছবি আঁকিবার চেষ্টা করি-না কেন। ভারত-শিল্পীগণের দ্বারস্থ হইলাম, তাঁহারা তুলিকা ও লেখনী তুলিয়া লউন, এবং নিজের একটি পরমপ্রিয় কন্যা থাকিলে তাহাকে কিরূপে মানুষ করিতেন— কেবলমাত্র বিবাহের পাত্রী নহে, কিন্তু জীবনের যাত্রী হিসাবে তাহাকে গড়িতে চাহিলে কী

কী মালমসলা ব্যবহার ও কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট বর্ণনাদানে আমাদের বাধিত করুন। আমাদের মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা ও দেশের হিতাহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত জানিয়া নিশ্চয়ই আমরা তাঁহাদের সদুপদেশ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না।

'পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ'— কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কোন্ মহাপ্রলয় সৃজিত হইতেছে? যাহাই আসুক ও যাহাই হউক, আমরা নিজেদের প্রস্তুত রাখিলে তরঙ্গের অভিঘাত অগ্রাহ্য করিতে পারিব। আধুনিক বঙ্গরমণীকে কোন্ ছাঁচে ঢালিলে ভালো হয় সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকিলে অনেক নিষ্ফলতা ও বাক্‌বিতণ্ডা হইতে অব্যাহতি পাইব। এখন 'বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়, ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।'

ভদ্রতা

ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম, এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশি। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ, এবং উভচর।

এই বন্ধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যোচিত যে-কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়; নচেৎ বাকি শুধু উচ্ছৃঙ্খল একাকার পশুত্ব, কিংবা মুক্ত নিরাকার দেবত্ব।

অবশ্য যেখানে ভালোবাসা ভক্তি ভয় বা অন্য কোনো ভ-পূর্বক ভাবাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতার কথা ওঠেই না— কারণ খণ্ড তো সমগ্রের অন্তর্গত। যেখানে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, সেখানে ব্যবহার তো আপনা হতেই শুধু শিষ্ট কেন, মিষ্টই হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অপরিচয় বা অতিপরিচয় বা ঔদাসীন্যবশত মন সহজে অনুকূল নয়, সেইখানেই ভদ্রতার শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনোভাব যেমনই থাকুক-না কেন, লোকের সঙ্গে সদ্‌ব্যবহারের নাম ভদ্রতা। এবং যে সমাজ যত সভ্য, তার লোকব্যবহার তত সদ্ভাব ও সুরুচিব্যঞ্জক।

সকলের মত এক না হলেও যেমন কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মত দিতে হয়, নইলে কাজ চলে না, তেমনি সকলের মন সমান না হলেও সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাত্র ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাকে বলে রীতি। ভদ্রতা রীতিমাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি উদার। কারণ রীতি ক্রিয়াকর্মক্ষেত্রে ও স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ; কিন্তু ভদ্রতা সমাজবিশেষ ও স্থানবিশেষ ছাড়িয়ে

সকল সমাজ এবং সকল অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। মানুষমাত্রেই পরস্পরের কাছে তা সর্বদা ও সর্বথা দাবি করতে পারে।

অপরপক্ষে নীতির তুলনায় ভদ্রতার ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ। কোমর বেঁধে পৃথিবীর দুঃখ দূর বা পরের উপকার করতে যাওয়া, কিংবা ন্যায়ান্যায়ের বিচারপূর্বক চলা, অথবা মহৎ কর্তব্য পালন করা ভদ্রতার এলাকা নয়। যারা কাছাকাছি আছে, কিংবা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে, তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সাময়িক এবং উপস্থিত নিয়ে তার কারবার, কিন্তু অভাবপক্ষে তারই মধ্যে খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারে।

কিন্তু রীতির সঙ্গে ভদ্রতার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, সব সময় সকলের প্রতি সকলের মনে সমান সদ্ভাব থাকা যখন সম্ভব নয়, তখন অন্তত বাইরের প্রকাশে সুষমা বিধানার্থে অনুষ্ঠানের ন্যায় ব্যবহারকেও কতকগুলি নিয়মাধীন করা সমাজ আবশ্যক মনে করে। আর, নীতির সঙ্গে তার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যদি মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাকত ও পরস্পরের মনে আঘাত দেবার সহজ অপ্রবৃত্তি না হত, তা হলে দীর্ঘকাল ধরে বহু লোকের পক্ষে সে নিয়ম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব হত। সুতরাং ভদ্রতাকে সংক্ষেপে লোকব্যবহারের ক্ষুদ্র রীতিনীতি বলা যেতে পারে। কিংবা মনুষ্যসম্বন্ধের 'লসাগু', অর্থাৎ প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি সেই পরিমাণ সদ্ভাবপ্রকাশ, যেটুকু নইলে জীবন-যান তৈলাভাবে অচল হয়ে পড়ত। কি ঘরে, কি বাইরে, এই সামান্য স্নেহলাভেও যে অনেক সময় মানুষকে বঞ্চিত হতে হয়, সেটি বড়োই দুঃখের বিষয়। অবশ্য সভ্যসমাজে অধিকাংশ লোকই স্পষ্টত অভদ্র নয়; কিন্তু যে মার্জিত ও মোলায়েম,

সদাশয় ও সুশ্রী, চৌকশ ও চোস্ত ব্যবহারকে যথার্থ ভদ্রতা বলা যেতে পারে, তাও সুলভ নয়।

অনেকে আজকাল আক্ষেপ করেন যে, একালের ছেলেদের ভদ্রতা কমে গিয়েছে। যেহেতু অল্প লোকেরই ত্রিকালজ্ঞ হবার সুযোগ ঘটে, সেকারণ আমি এ কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে এটুকু স্বীকার্য যে, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার দিন এ দেশে গেছে বা যেতে বসেছে।

তার কারণ হয়তো এই যে, একালের লোকের সময় সংক্ষেপ। প্রত্যেক চিঠির লাইনজোড়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শিখতে ও লিখতে হলে বোধ হয় ইস্কুলের পাঠ বন্ধ করতে হয়। আর উঠতে-বসতে যদি প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, কিংবা সকলের কুশলপ্রশ্ন অন্তে অন্য কথা পাড়তে হয়, তা হলেও আধুনিক জীবনযাত্রা চালানো দায় হয়ে পড়ে।

আর-এক কারণ এই হতে পারে যে, একালে গুরুলঘু সম্পর্কের দূরতাকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়েছে। মাকে 'আপনি' বলা, বাপখুড়োর সামনে তটস্থ হয়ে থাকা, শাশুড়ি-ননদের কাছে এক হাত ঘোমটা টেনে ইশারায় কথা কওয়ার আমলের তুলনায় আজকাল আমরা হয়তো অপেক্ষাকৃত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন যে ব্রাহ্মণ জাতি— যার তুল্য গুরু সেকালে ছিল না— তাঁরাও যখন কলিকালের পূর্বপ্রাপ্য পদমর্যাদাচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন, তখন অন্যান্য গুরুজনকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ বাকিখাজনা এবং উপরি পাওনার লোভ সংবরণপূর্বক সমতল সমকক্ষতায় শ্রীক্ষেত্রে হাসিমুখে নাবতে হবে ও কালের সঙ্গে সমপদবিক্ষেপে চলতে হবে। সুতরাং উপরোক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি মার্জনা করে দেখতে হবে যে, সারভূত

ভদ্রতার লক্ষণ কী— যে ভদ্রতা সব দেশের, সব কালের, এবং সব পাত্রের।

প্রতীক বা স্মরণচিহ্ন রচনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। অসীমকে সসীমে বাঁধবার, নিরাকারকে সাকারে ধরবার প্রয়াস তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৌত্তলিক; তবে প্রকাশের তারতম্য আছে, সাকারীকরণের মাত্রাভেদ আছে। মূর্তিও সাকার, মন্ত্রও সাকার, —কিন্তু কমবেশি। বড়োকে ছোটোর দ্বারা, ব্যষ্টিকে সমষ্টি দ্বারা, অরূপকে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য অস্পষ্টকে পরিস্ফুট এবং অলক্ষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। তোমার মনে অনেকখানি ভক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে তার কোনো চিহ্ন না দেখালে আমিই বা জানব কী করে, তুমিই বা জানাবে কী করে? অতএব প্রণাম করো; অতএব দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন লৌহদ্বারা স্মরণ করাও, তার আনন্দ সিন্দূর-অলক্তক-তাম্বুলের লোহিত রাগে ব্যক্ত করো; এবং বৈধব্যের শূন্যতা বরণাভরণহীন বেশে সূচিত হোক। খৃস্টের পরার্থপর অমানুষিক যন্ত্রণা একটি ক্রুশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ, বিশ্বলক্ষ্মীর অপরিসীম অনির্বচনীয় সৌন্দর্য একটি পদ্মে বিকশিত, ভক্তচক্ষে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি একটি অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এই চিহ্নতন্ত্রের লাভও আছে, যেহেতু মানুষের সহজ-বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংহত সংযত করে আনবার সাহায্য করে; আবার ক্ষতিও আছে, যেহেতু জড়বস্তু দ্বারা চেতনকে, অনুষ্ঠান দ্বারা অনুভূতিকে চাপা দেবারও সাহায্য করে। প্রণাম আন্তরিক ভক্তি জ্ঞাপনও করতে পারে, আবার তার অভাব গোপনও করতে পারে। সেইজন্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সেই-সকল প্রমাণের প্রতি বোধ হয় মানুষের বেশি ঝোঁক

হয়েছে, যা অত সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী নয়— যা একটিমাত্র নির্দিষ্ট আচরণে পর্যবসিত নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

এইজন্যই বলছিলুম যে আনুষ্ঠানিক বা স্থূল ভদ্রতা অপেক্ষা আজকাল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর মূলভদ্রতার মূল্য বেশি হতে চলেছে। দেশকাল-ভেদে প্রথমোক্তের নানা ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু শেষোক্ত সম্বন্ধে মতভেদের অবসর কম। ভদ্রতার এই বাহ্য আকৃতি-বৈষম্য ভুলে গিয়ে তার অন্তর্প্রকৃতিবিশ্লেষণের প্রতি মন দিলে দেখতে পাব যে, তার কতকগুলি লক্ষণ সর্বজনীন ও সর্ববাদিসম্মত।

২

প্রথমত, ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা এবং তার ফুল সংযম। উপস্থিতমত পরের যাতে কষ্ট না হয়, আমার বাড়ি এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, ভদ্রলোকের স্বভাবতই এই ইচ্ছা হয়। এবং সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে হলে অনেক সময় নিজের তৎকালীন প্রতিকূল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের আপাত-সুবিধা বিসর্জন দিতে হয়। আমার যে-সময়ে বিশেষ জরুরি কাজ আছে, সে-সময়ে হয়তো একজন সামান্য আলাপিনী (বা অপরিচিতা) দেখা করতে এলেন; ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তাঁর আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। যতক্ষণ তাঁর উঠতে ইচ্ছা না হয়, আমার হাজার অসুবিধা হলেও বলবার জো নেই— 'সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা, এ কি আর ভালো লাগে!' আমাদের দেশে দেখাসাক্ষাতের একটা নির্দিষ্ট সময় নেই বলে এ বিষয় আরো ভুগতে হয়। কিংবা হয়তো কোনো মাননীয় ব্যক্তি

আমার মুখের সামনে হয়কে নয়, সাদাকে কালো বলছেন; আমার কণ্ঠাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে— 'ওগো, তুমি মিথ্যে কথা বলছ'; কিংবা আর-একজনকে— 'তুমি দু দিন আগেই যে ঠিক এর উল্টো কথা বলেছিলে'; কিংবা আর-একজনকে— 'তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ দোষে এটি ঘটেছে'; কিংবা আর-একজনকে— 'অন্যের নিন্দা করবার আগে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখলে ভালো হয় না'?

নাঃ, একালেও এ দেশে ভদ্রতা বড়ো কড়া মনিব, বিশেষত মেয়েদের পক্ষে। চড়া গলায় কড়া কথা বলবে না, বেশি চেঁচিয়ে হাসবে না, অতি লোভীর মতো খাবে না, গালমন্দ দেবে না, মুখে মুখে জবাব করবে না, অতিরিক্ত চাঞ্চল্য বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করবে না— ইত্যাদি নানাপ্রকার নেতিমূলক বিধান তারা বড়ো হলে মেনে চলতে বাধ্য। এক কথায়, তাদের শরীরকে যেমন লজ্জাবস্ত্রে আবৃত রাখতে হয়, ব্যবহারকেও তেমনি সম্ভ্রমের সূক্ষ্মবর্মে সুসম্বৃত রাখা চাই। ছেলে সম্বন্ধে কড়াক্কড়ির মাত্রা কিছু কম, কারণ তাদের জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু সভ্যসমাজে তাদেরই বা শাসন মন্দ কি?

পাশ্চাত্য দেশে, যেখানে সমাজক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা প্রচলিত, সেখানে উভয়পক্ষকেই সামাজিক নিয়মাধীন হয়ে চলতে হয়। আমাদের দেশে সে প্রথা না থাকলেও পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে ভদ্রতারক্ষার নিয়ম যথেষ্ট ছিল। এখন যদি সে বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়ে থাকে তো অন্তত একটা কোনো কালোচিত আদর্শ যাতে রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক পরিবারের যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ এ-সব বিষয়ে ছেলেবেলার অভ্যাসই প্রবল। দুর্মুখ হওয়াই কিছু তেজস্বিতার পরিচয় নয়, দুর্ব্যবহার করাই কিছু চরিত্রবলের প্রমাণ নয়। বদরাগী ও

রাশভারী, এ উভয়প্রকার লোকের মধ্যে সমাজে প্রতিপত্তি কার বেশি? —সত্যমেব জয়তে, নেতরং।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, এই প্রসঙ্গে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ না করে থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতোজোড়াটার সঙ্গে আমরা বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারি নে? অবশ্য সাহিত্যচর্চার যদি কোনো উচ্চ লক্ষ্য থাকে তো সে কেবল লীলা-কমলের ব্যজনে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি। অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই। কিন্তু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মারাত্মক আর যে-কোনো প্রকার ভাষার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন-না কেন, ইতরতা বা রূঢ়তার অস্ত্রপ্রয়োগ এ স্থলে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?

স্পষ্টবাদীর দল উল্লিখিত সংযমাত্মক ভদ্রতাকে কপটতার নামান্তর মনে করেন। 'আমার বাপু স্পষ্ট কথা' বলে আরম্ভ করে তাঁরা মুখে যা আসে তাই বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, বরং গর্বই অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মন এবং মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বেঁধে না রাখলে দু দিনও কি সমাজ টিঁকতে পারে? আমার তো মনে হয় কতকগুলি কথা বা বিষয়কে একঘরে করা ভালোই হয়েছে। স্পষ্ট-বাদিতার দোহাই দিয়ে ভদ্রসমাজে সে বাঁধ ভাঙায় আমি তো কোনো বাহাদুরি বা সুবিধা দেখতে পাই নে। সামান্য একটি খিল খুলে দিলে, অতি বড়ো বন্ধনও সহজে শিথিল হয়ে পড়ে; একটি পরদা তুলে ফেললেও অনেকটা আব্রু নষ্ট হতে পারে। কথার সংযম কিছু কম

গুরুতর জিনিস নয়। যদি তা কপটতাই হয় তো সে-পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের কান যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম শব্দের বেশি শুনতে পায় না, চোখ যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরতার বেশি দেখতে পায় না; তেমনি বোধ হয় অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য আমাদের মন গ্রাহ্য বা সহ্য করতে পারবে না বলেই ভগবান দয়া করে অজ্ঞানের আড়াল রেখে দিয়েছেন। ঐখানেই তো তাঁর ভদ্রতা! বেশি তলিয়ে বুঝে লাভ কী? অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়; কিংবা ঐ কথাই একটু ঘুরিয়ে ভাব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় সত্য খুঁজতে খুঁজতে শুধু 'নিখিল অশ্রুসাগরকূলে' গিয়ে পৌঁছতে হয়।

৩

কিন্তু অল্পমাত্রায় যা উপকারী, বেশিমাত্রায় তাতেই হিতে বিপরীত হতে পারে, যথা হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ। পরের মন-লাগানো কথা বলব না বলেই যে পরের মন-জোগানো কথা বলতে হবে, তার কোনো মানে নেই। কেউ কেউ ভদ্রতার সঙ্গে খোশামুদির তফাত করতে পারেন না বলে নিজের মানরক্ষার জন্য পরকে অপমান করা আবশ্যক এবং কর্তব্য বোধ করেন। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে বলে তো আমার বিশ্বাস— ভদ্রতার সর্বভূতে সমান দৃষ্টি, খোশামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি; ভদ্রতা নিজের অসুবিধা করেও পরের সুবিধা করে দিতে উৎসুক, খোশামুদি নিজের সুবিধাটুকুই বোঝে ও খোঁজে; ভদ্রতা চৌকশ, সরল ও সুন্দর— খোশামুদি একপেশো, কুটিল ও কুৎসিত। স্বীকার করি, বড়োলোক দেখলে মানুষের মুখের ভাব আপনা হতেই একটু মোলায়েম হয়ে আসে, গলার স্বর অজ্ঞাতসারে

অতিকোমল স্বরে নাবে ; এবং বিলাসপুরের মহারানী তোমার আমার বাড়ি পায়ের ধুলো দিলে তাঁর সমাদরের জন্য তুমি আমি যত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ব, ও-পাড়ার পাঁচিধোবানি বেড়াতে এলে মোটেই সেরকম হব না। কিন্তু বহুকালের অভ্যস্ত, সামাজিক স্তরভেদঘটিত ব্যবহার-তারতম্যের সঙ্গে স্বার্থমূলক বাড়াবাড়ির যে তফাত, আশা করি, চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখানো অনাবশ্যক। গায়ে পড়ব না মনে করলেই কি দশ হাত দূরে থেকে মানুষকে নখী দন্তী শৃঙ্গীর দলে ফেলতে হবে? দুঃখের বিষয়, যতদিন বড়োলোকমাত্রই প্রায় খোশামোদের বশ থাকবেন, এবং যতদিন পৃথিবীতে বড়োছোটোর মধ্যে অবস্থা ও ক্ষমতার এমন আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকবে, ততদিন খোশামোদকে সমাজ থেকে তাড়ানো মুশকিল। ভদ্রতাকে এইরকম অনেকে ছদ্মবেশরূপে ব্যবহার করে বলে অতিভদ্রতাকে লোকে যেন সন্দেহের চক্ষে দেখে ; কারণ তারা ঠেকে শিখেছে যে অতিনম্র বিনীত ব্যবহারই দুরভিসন্ধির স্বাভাবিক অস্ত্র। ধর্মের বাহ্যাড়ম্বরও এই দোষে দূষিত। সংসারে জহর দুর্লভ হলেও তত ক্ষতি ছিল না, যদি জহুরি ততোধিক দুর্লভ না হত। একটু সংসারজ্ঞানের চর্চাই খোশামুদি এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে পৃথিবীতে এসেছি, সেটা কিরকম জায়গা জানতে না পারলে উন্নতিচেষ্টা করব কী করে? যেখানে শক্ত, সেইখানেই ভক্ত (বা অতিভক্ত!)— যেখানে অক্ষমতা, সেইখানেই পরমুখাপেক্ষিতা। ছোটো ছেলে কি, কম খোশামুদে? তবে তাদের সবই সুন্দর!

আর-একটি জিনিস আছে, যা ভদ্রতার বেনামী চলে, অথচ বেশি পরিমাণে যা ক্ষতিকর ; সেটি হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। এটি আমাদের দেশের ও জাতের একটি রোগবিশেষ বললেও অত্যুক্তি হয় না, এবং খুব কম

লোকই সে রোগমুক্ত। মনে মনে আমার কোনো একটি অনুরোধ রক্ষা করবার মোটেই ইচ্ছা নেই, এমন-কি, অভিপ্রায় নেই, অথচ চক্ষুলজ্জায় পড়ে আমি অনুরোধকর্তার সামনে (বেশ একটু উৎসাহ সহকারেই!) তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এ স্থলে যদি বিরক্তভাবে কাজটা করে দিই তো মন্দের ভালো ; কিন্তু একবার একজনের জন্য করলেই তো অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঢেঁকি গিললেও নিজের হজমশক্তির উপর একটু অত্যাচার করা হয়! আবার যদি করব বলে না করি, তা হলে নিজের কথারও খেলাপী হয়, নিজের মনও খুঁতখুঁত করে, আর অনর্থক পরের আশাভঙ্গও করা হয়। মতামত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তুমি সজোরে একটা মত ব্যক্ত করছ, সেটা হয়তো আমার মোটেই মনঃপূত নয় ; অথচ আমি চক্ষুলজ্জার খাতিরে হয় চুপ করে থেকে জানাই যে মৌনং অসম্মতিলক্ষণং, সেটা বরং ভালো ; আর নয়তো আমৃতা-আমৃতা করে তোমার মতে সায় দিয়ে যাই, তাতে অনেক সময় আমার নিতান্ত অনভিপ্রেত, এমন-কি, অন্যায় কার্যে পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে অন্তরাত্মার অবমাননা করা হয়। কেন এ বিড়ম্বনা ?— তার চেয়ে গোড়ায় স্পষ্ট অথচ ভদ্রভাবে 'না' বলতে বা প্রতিবাদ করতে পারলে দু পক্ষেরই ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধা বেঁচে যায়, এবং মতান্তর থেকে মনান্তর পর্যন্ত গড়ায় না। 'ভালোমানুষ'কে যেমন আমরা 'গো-বেচারা'র দলে ফেলেছি, তেমনি ভদ্রলোক বলতেও যেন দাঁড়িয়েছে এই যে, তাকে যে-সে মনে করলেই ফাঁকি দিতে ও ঠকিয়ে নিতে পারে ; 'বৈকুণ্ঠের খাতা' দ্রষ্টব্য। ভদ্রতার সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানোই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ, লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ, এমন সম্মিশ্রণ এ দেশে এত দুর্লভ কেন? কেন খাঁটি লোক

যেন রুক্ষ হতেই বাধ্য, এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর জুলুম হওয়াটাই নিয়ম? তাও বলি যে, দাতা ও গ্রহীতা না হলে যেমন দান সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অনুরোধকারীও মাত্রা বুঝে পেড়াপিড়ি করলে তবেই ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব, নইলে অযথা টান পড়লে ছিঁড়তে কতক্ষণ!

এইটেই ভদ্রতার প্রধান অসুবিধা যে, অন্য লোকে শেষ পর্যন্ত তার সুবিধাটি আদায় করে নিতে পারে, তার প্রতি অন্যায় দাবি করতেও কুণ্ঠিত হয় না, কারণ ভদ্রলোক বেচারা কপালে হুণ্ডির ছাপ মেরে বসে আছে। ভদ্র এবং অভদ্রের সংঘর্ষে প্রথমোক্তকেই অনেক সময় হার মানতে হয়, কেননা পূর্বেই বলেছি কতকগুলি অস্ত্রপ্রয়োগ তার ধর্মবিরুদ্ধ; অভদ্রের তো সে বালাই নেই। গল্প শুনেছি যে, বিলাতে বড়োলোকেরা রাস্তাঘাটে পারতপক্ষে ছোটোলোকদের অপমানসূচক টিটকারির প্রতিবাদ বা প্রতিকার করেন না, বিশেষত যদি কোনো ভদ্রমহিলা সঙ্গে থাকেন।

৪

সংযম যেমন ভদ্রতার প্রধান নিবৃত্তিমূলক লক্ষণ, তেমনি সর্বভূতে সমান দৃষ্টি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা তার প্রধান প্রবৃত্তিমূলক লক্ষণ। অর্থসামর্থ্য বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ মানমর্যাদা যার যেমনই থাকুক-না কেন, কম হলেও তাকে পায়ের তলায় ঠাসবার দরকার নেই, বেশি হলেও তার পায়ের তলায় পড়ে থাকবার দরকার নেই। যাকে ভালো লাগে তার সঙ্গে গলাগলিও কোরো না, যাকে মন্দ লাগে তাকে গালাগালিও দিয়ো না, সকলের প্রতি সহজ সদয় ব্যবহার করো— এই হচ্ছে ভদ্রতার বিধান। এই সামঞ্জস্যজ্ঞান থেকে একটু নির্লিপ্ত ভাব আসতে পারে—

অবশ্য প্রকাশ্যে। ভদ্রতা ব্যবহার-নীতি মাত্র, মনের নিয়ন্তা নয়। তবে মনস্তত্ত্ববিৎরা বলেন যে, বাইরে যে ভাব দেখানো যায়, সেটা ক্রমে মনের ভিতর পর্যন্ত সংক্রামিত হয়; যেমন রাগের প্রকাশ দমন করতে করতে রাগ কমে আসা সম্ভব। (কিন্তু অনুরাগ কমে না বাড়ে?)— পূর্বে ভদ্রতাকে বাঁধ বলেছি; আবশ্যক স্থলে এই বাঁধই যে প্রাচীরের কাজ করতে পারে, তার আর আশ্চর্য কী? যেখানে এই প্রাণের আড়ালটুকু রাখতে চাই নে— অর্থাৎ যেখানে প্রকাশই উদ্দেশ্য, সেখানে অবশ্য ভদ্রতার কাজ ঘুরোয় এবং উচ্চতর নেতার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে সে সরে পড়ে।

সেইজন্যই আত্মীয়তা যেখানে শুধু রক্ত নয়, অনুরক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ভদ্রতার ব্যবধান সেখানে অনাবশ্যক— এমন-কি, অপ্রীতিকর। আমার মনে আছে ছেলেবেলায় কোনো-একটি পূজনীয়া আত্মীয়া যখন আমাদের 'তুই' না বলে 'তুমি' সম্বোধন করতেন তখনই বুঝতুম যে, তিনি আমাদের উপর রাগ করেছেন! ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোকের মধ্যে মনান্তর স্থলে এরূপ কপট ভদ্রতারীতির দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। সেকেলে গৃহিণী যেখানে গয়না খুলে উপোস করে চুল এলিয়ে গোসা-ঘরের মেঝেয় লুটোতেন এবং যথাসময়ে সরল মামুলিভাবে মান ভাঙিয়ে নিতেন; আজকালকার গৃহিণী সে স্থলে দৈনিক কর্তব্যপালনের তিলমাত্র ত্রুটি না করেও মৌখিক ভদ্রতারক্ষার অন্তরালে যে দুর্জয় অভিমান পোষণ করতে পারেন, তাকে কাবু করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেকালের সমতল যুদ্ধক্ষেত্র এবং একালের গুহাগহ্বরমণ্ডিত কণ্টকজালখণ্ডিত ক্ষেত্রে যা তফাত— এও তাই আর-কি! অতি দুঃখের বিষয়, নিকট এবং স্থায়ী সম্পর্ক স্থলেও যখন সব সময়ে আশানুরূপ মনের মিল থাকে না,

তখন আত্মীয়ের মধ্যেও সাধারণত ভদ্রতার নিয়ম উপেক্ষা না করাই ভালো। এমনও লোক আছেন, যাঁরা বাইরে অতি বিনীত, কিন্তু ঘরে উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ করে থাকেন। যেন ভদ্রতা একটা পোশাকী বেশ মাত্র, যা ঘরে এসে খুলে না ফেললে ময়লা হয়ে যেতে পারে। অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টা যাদের একসঙ্গে থাকতে হয় তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার নিয়ম শিথিল না করে দিলে চলে না ও সাতখুন মাপ করতেই হয়। তবে আজকালকার যেরকম মতিগতি, তাতে রাশ ঢিলে না দিয়ে টানাই দরকার। এই কথাটাই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, একসঙ্গে থাকতে গেলে অষ্টপ্রহর মেজাজে মেজাজে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়ে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, দৈনিক-কর্মজীবনযাত্রায় অনিবার্যভাবে যে ধূলিজাল উত্থিত হতে থাকে, ভদ্রতার স্নিগ্ধ শান্তিবারিসিঞ্চনই তা কথঞ্চিৎ নিবারণের অন্যতম উপায়। নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অধিকাংশ লোকে বুঝতে পারবেন যে, সময়মত একটু সহৃদয় ব্যবহার, অবস্থা বুঝে একটু সংযম, একটি মিষ্টি কথা, একটি হাসির আলোর অভাবে শেষে পরস্পরের মনে এমন দাগ দেগে যায় যে, হাজার চেষ্টাতেও তা মুছে ফেলা যায় না; ভাঙা জোড়া লাগলেও জোড়ের চিহ্ন চিরকাল থেকে যায়। হাঁড়িকলসী একসঙ্গে থাকলেই ঠোকাঠুকি হয়, সে কথা সত্য; কিন্তু একটু ঘন করে প্রলেপ দিলে আওয়াজটা কম হয়, এবং টেঁকেও বেশিদিন। বাঙালি জাত পরিবারগত-প্রাণ। সেই পারিবারিক জীবনের উপর প্রায় তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। তাই সুখের সংসার গড়ে তোলবার কোনো উপকরণই আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। বাইরে যতই মানসম্ভ্রম নামডাক থাকুক-না কেন, বাড়ির ভিতরে শান্তি না থাকলে কোনো

সংসারী লোকের মনই তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলা -পূর্ণ গৃহে এসে বাইরের বিতণ্ডা ও বিরক্তি ভুলতে পারা যায়।

কিন্তু আত্মীয়তা-ক্ষেত্র এত জটিল ও গভীর, এতরকম বাধ্যবাধকতা-পূর্ণ ও দেনাপাওনা-জড়িত যে, সেখানে ভদ্রতার চেহারা ভালো ফোটানো যায় না ও বেশি নীতির কাছঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে অনাত্মীয় যে বিস্তৃত সমাজ পড়ে আছে, সেইখানেই ভদ্রতার যথার্থ রূপ ও কদর বোঝা যায়, সেইটেই তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র। কারণ এই ভদ্রতা-সেতু পার হয়ে তবে তো ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছনো যায়— যদি কপালে থাকে! এক-এক সময় আমার মনে হয় যে, হয়তো এতে অনেক সময় নষ্ট হয়; হয়তো দুর্লভ মনুষ্যজন্মে কত দুর্লভতর বন্ধুত্ব-বিকাশ হতে পারত, যদি এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে না হত। যদি সামাজিক ব্যবধান এত দুর্ভেদ্য না হত, যদি সামাজিক বিধান এত দুশ্ছেদ্য না হত, যদি প্রত্যেক পরিবার এক-একটি দ্বীপের মতো স্বতন্ত্র না হত— তা হলে হয়তো জীবনের অনাবিল সঙ্গসুখের মাত্রা অনেক বেড়ে যেত। কিন্তু বলা যায় না, সংসারে যদি সজ্জন অপেক্ষা দুর্জনের সংখ্যাই বেশি হয় তো চলিত নিয়মই ভালো। অনেক প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়ে ছেঁকে এলে তবেই হয়তো স্বচ্ছ জিনিসটি পাওয়া যায়। তা ছাড়া দুর্লভেরই মূল্য বেশি, তা তো নিত্যই দেখতে পাই। একটু দূরতা, একটু দুর্গমতা, একটু রহস্য ভেদ করতে না হলে, একটু কৌতূহলের অবসর না দিলে, মেলামেশার তত আগ্রহ বা আস্বাদ থাকে না। ‘পড়া পুঁথি সম’ আত্মীয়সভার মাঝে একটি বাইরের লোক দৈবাৎ এসে পড়লে সকলে কিরকম তাজা হয়ে ওঠে ও কথোপকথনের মরাগাঙে কিরকম জোয়ার আসে, তা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

সেইজন্যই তো নূতনের এত মাহাত্ম্য, অজানার এত আকর্ষণ। (আর সেইজন্যই কি ভগবান নিজেকে রহস্যের জালে আবৃত রেখেছেন?) —অন্তত এইজন্যেও মেয়েদের শিক্ষা বেশি পুরুষালী করবার পক্ষপাতী আমি নই; তাতে তাদের বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তাদের স্বকীয় মর্যাদা খর্ব করে নিকৃষ্ট নকলে পরিণত করা হয়।

৫

অনেক প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার ফলে অবশেষে এইটুকু পাওয়া গেল যে, ভদ্রতা বিস্তৃত নীতিরাজ্যের সামান্য একটি অংশমাত্র হলেও তার গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কথা ও কার্য— এই দুই ক্ষেত্রে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, এবং দুইয়েরই বিধিনিষেধ আছে। সেগুলি এত লোকবিশ্রুত, বাপমায়ে এত করে সেগুলি ছেলেদের মনে বসাবার চেষ্টা করেন যে, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। জানে শোনে সবাই সব, কিন্তু সব সময় কাজে পেরে ওঠে না, সেইটিই দুঃখের বিষয়। 'পঞ্চ' নামক বিলাতি হাসির কাগজে মজার কথাগুলি প্রায়ই এই দুই শিরোনামাঙ্কিত থাকে: এক, 'Things that had better been left unsaid'; আর-এক, 'Things that ought to have been expressed otherwise'। অর্থাৎ যা না বললে ভালো হত, এবং যা অন্যরকমে বলা উচিত ছিল। ভদ্রতা সম্বন্ধে বাচনিক নিষেধ অধিকাংশ এই দুই শ্রেণী ভুক্ত। এ বিষয় 'সত্যং ব্রূয়াৎ' শ্লোকে যে লাখ কথার এক কথা বলা হয়েছে, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। কার্যক্ষেত্রে ভদ্রতার এইরকম কোনো মূলমন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে কি না জানি নে; তবে ইংরাজিতে যাকে ব্যবহারের 'golden rule' (বা

সোনার কাঠি!) বলে, সেটা এ স্থলেও খাটে। ছেলেবেলায় তার যে অনুবাদ শুনে হাসি পেত, সেটি এই: 'নিজে ব্যবহৃত হতে চাহিবে যেমন, কর কর ব্যবহার অপরে তেমন!' এর ভাষা যেমনই হোক, ভাব ঠিক আছে; এবং তার এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ছোটোখাটো বিষয়ে রীতরক্ষা, এবং অন্যের যাতে সুবিধা সাহায্য বা তুষ্টিসাধন হয়, তাই করাই ভদ্রতা; ও তদ্‌বিপরীত করাই অভদ্রতা। আন্তরিক ও আনুষ্ঠানিক নামক আর দুই মূল শ্রেণীতে ভদ্রতাকে ভাগ করেছি ও বলেছি যে আজকাল প্রথমোক্তের প্রতিই লোকের বেশি ঝোঁক; এবং সংযম ও সাম্যভাব তার দুই প্রধান সর্বজনীন উপাদান। সংযম যে শুধু পরকে কষ্ট না দেওয়ার বেলায়ই ব্যবহার্য তা নয়, কিন্তু যেখানেই সুরুচির ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা, সেইখানেই প্রযুজ্য। সুরুচি পদার্থটি এত সূক্ষ্ম যে, তাকে কোনো কাটাছাঁটা নিয়মের মধ্যে ধরাবাঁধা যায় না, এবং সমাজের স্তরভেদ অনুসারে তার আকারও বিভিন্ন হয়। কথায়ই বলে লোকের ভিন্ন রুচি। তবে সকল দেশের ভদ্রলোককেই মোটামুটি এক সমাজভুক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। লোকসমাজে অযথা পরনিন্দা বা আত্মপ্রশংসা করা, পরের উপকার করে নিজের মুখে দশ বার বলা বা তাকে মনে করিয়ে দেওয়া, পরের আর্থিক অবস্থা বা অপর গোপনীয় পারিবারিক কথা সম্বন্ধে খুঁচিয়ে প্রশ্ন বা সমালোচনা করা, অনাহূত পরকে পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়া, নিজের টাকার গল্প করা প্রভৃতি যে বাচনিক ক্ষেত্রে মোটেই সুরুচিসংগত নয়, তা এঁরা সকলেই স্বীকার করবেন। পূর্বেই বলেছি যে, স্পষ্ট অভদ্রতা— যথা পরকে মুখের সামনে অপমান, বা মারধোর চেঁচামেচি করা ইত্যাদি— আজকাল সভ্যসমাজে বিরল। কিন্তু আমাদের ভদ্রতম সমাজেও সুরুচির ব্যতিক্রম তেমন

বিরল নয় দেখে দুঃখিত হতে হয়; ও সেইজন্যই এত কথা বলা। যে ভারতভূমি শিষ্টতার আকর বলে খ্যাত ছিল, অন্যান্য অবনতির সঙ্গে যাতে এই পৈতৃক সম্বলটুকুও তার নষ্ট না হয়, অন্তত আমরা মেয়েরা বোধ হয় সেদিকে একটু লক্ষ রাখলে কৃতকার্য হতে পারি। আনুষ্ঠানিক ভদ্রতাকে অপেক্ষাকৃত নিচু আসন দিয়েছি বলে যেন কেউ এ ভুল বিশ্বাস না করেন যে তাকে একেবারে গৃহ এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় মেয়েরা স্বভাবতই কিছু অনুষ্ঠানপ্রিয় বা বাহ্যনিদর্শনভক্ত। জানি তুমি ভালোবাস, বা তুমি ভক্তি কর, বা তুমি স্নেহ কর— তবু মাঝে মাঝে সে কথা বল', কাজে দেখিয়ো, ভাবে জানিয়ো— 'মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো'— এই হচ্ছে তাদের ভাবখানা। বেশি সূক্ষ্ম তারা ধরতে পারে না, বেশি ব্যাপক বুঝতে পারে না; তারা চোখে দেখতে চায়, হাতে পেতে চায়, প্রকাশ চায়, প্রমাণ চায়। তা ছাড়া অনুষ্ঠানের শ্রীটুকুও তারা ভালোবাসে। কলমের এক আঁচড়ে বিবাহ আইনসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-আচারের চিত্রবৈচিত্র্য ভিন্ন মেয়েদের মন ওঠে না। সেইজন্য পুরুষরা যখন সমাজ-সংস্কারের অছিলায় (এবং হয়তো আসলে খরচ কমাবার অভিপ্রায়ে!) বিবাহের নিমন্ত্রণফর্দ বা ভোজের বাহুল্য ছেঁটে দিতে চান, তখন বাড়ির মেয়েরা কিছুতেই রাজি হন না। সামাজিক ভদ্রতার অনুষ্ঠানগুলি, যথা, আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা, তাদের চিঠিপত্র লেখা, অসুখ-বিসুখে খোঁজখবর নেওয়া, ক্রিয়াকর্মে যোগদান, তত্ত্বতল্লাশ, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি প্রায়শঃ মেয়েরাই রক্ষা করে থাকেন, এবং না করতে পারলে কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু পুরুষেরা তো দেখেছি পরমাত্মীয় সম্বন্ধেও 'ভালো আছে' এইটুকু দূর থেকে জানতে পারলেই পরম নিশ্চিন্ত মনে

থাকেন; যদিও তাঁরা অনেকেই আত্মীয়ের বিপদে আপদে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এবং স্বজনবৎসল নন তাও বলতে পারি নে। তার এক কারণ বোধ হয় এই যে, গৃহ এবং তারই আঙিনারূপ যে সমাজ, তা মেয়েদের জীবনসর্বস্ব, কিন্তু পুরুষদের জীবনের ভগ্নাংশমাত্র। জীবনের আনন্দযজ্ঞে তাঁরা কেবল হোতা, মেয়েরাই যজ্ঞকর্ত্রী। এই-সকল কারণে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নিদেন মেয়েদের খাতিরে দেশকালপাত্রোপ-যোগী আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি রক্ষা করে চলাই ভালো। আত্মীয় বা অনাত্মীয় অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে সময়োচিত দুটো শিষ্ট কথা না বলা বড়োই দৃষ্টিকটু তা অন্যমনস্কতাবশতই হোক, সংকোচবশতই হোক, আর অপ্রবৃত্তিবশতই হোক। ভদ্রব্যবহার এমন যন্ত্রবৎ অভ্যস্ত হওয়া উচিত যে এরূপ অনবধান বা ত্রুটি কোনোমতেই সম্ভব না হয়। আমাদের নব্য-সমাজ রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতো এখনও সেকাল ও একালের মধ্যে দোদুল্যমান বলে এ-সব বিষয় একটা দু-তরফা ডিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কোনো একটি উচ্চপদস্থা স্বদেশিনী একবার আমাকে বলেছিলেন যে, আমাদের বর্তমান সমাজনীতি বিধিবদ্ধ করে ফেলা উচিত। কিন্তু সে বিধান গড়বেই বা কে, আর মানবেই বা কে? সামাজিক আইন জারি করবার জন্য যখন কোনো উপর-আদালত নেই, তখন এ-সকল নিয়ম আবশ্যকের চাকে এবং সুরুচির হাতে আপনি গড়ে উঠতে দেওয়াই ভালো। তবে মেয়েদেরই প্রধানত এ কাজে হাত লাগাতে হবে। কারণ অন্যত্র যাই হোক, সামাজিক ক্ষেত্রে তাদেরই বিধান শিরোধার্য।

আত্মীয়ের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়মের অভাব আমাদের নেই, কিন্তু সে গণ্ডির বাইরে গেলেই যেন জলে পড়তে হয়, কারণ মেয়েদের তার বাইরে যাবার হুকুম সেকালে ছিল না। একালে যখন তা হয়েছে, এবং শখ ও আবশ্যকমত পরিচিত অপরিচিত স্বদেশী বিদেশী সকলরকম সমাজেই আমাদের মেয়েদের অল্পবিস্তর মিশতে হচ্ছে, তখন লোক-ব্যবহারের কতকগুলি অলিখিত নিয়ম মেনে চলা নিতান্তই দরকার। সেগুলি দেশব্যাপী হওয়া বা সকল সমাজে গ্রাহ্য হওয়া যদিও এখনি আশা না করা যায়, তবুও স্বসমাজে, অন্ততপক্ষে স্বপরিবারে, চালাবার চেষ্টা করা যেতে পারে, এবং অনেক স্থলে করা হয়েও থাকে। যথা—কারো কারো মতে যে পরিবারের মেয়েরা বেরোন না, সে পরিবারের পুরুষদের সামনে অন্য পরিবারের মেয়েদের বেরোনো উচিত নয়। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে এবং আছে; কিন্তু যাঁরা এই মত-অনুসারে চলেন, তাঁরা ভেবেচিন্তে নিদেন একটা যা হোক সংগত সামাজিক নিয়ম বের করেছেন, এটা মানতে হবে। নিয়ম থাকাও চাই, অথচ এতটুকু নমনীয় হওয়া চাই যাতে অবস্থাভেদে ভেঙে গড়া যেতে পারে—উন্নতিশীল সমাজের এই তো লক্ষণ। যদিও নতুন নিয়ম গড়া নয়, পরন্তু গঠিত নিয়ম মেনে চলাই হিসেবমত ভদ্রতার কাজ। কারণ ভদ্রতার একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে সহজ ভাব। কষ্টকল্পনা বা সাধ্যসাধনা এসে পড়লেই যেন তার স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এবং এই সহজ ভাবটি একমাত্র অভ্যাসের দ্বারা লভ্য। বস্তুত সহজ হওয়া যে কত শক্ত, তা সামাজিক অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা যায় না। স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-শিক্ষারই অগ্রবর্তী উত্তরাধিকারী। এই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না

করে মেয়েদের অকালস্বাধীনতা দেওয়ার কোনো সুফল আমি তো দেখতে পাই নে। অনভ্যাসের সংকোচে যে ন-যযৌ-ন-তস্থৌ ভাব হয়, সেটা বড়োই অশোভন। নিয়মের অভাবে শিক্ষিত মেয়েদেরই অনেক সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ হয় তো অন্যে পরে কা কথা। যদি বিয়ের আগে পর্যন্ত আমার মেয়েকে ঘরে বন্ধ করেই রাখলুম, তা হলে স্বগৃহের গৃহিণী হওয়ামাত্র হঠাৎ কী করে সে ব্যাপকতর সামাজিক ভদ্রতা রক্ষা করে চলবে? সহজ মেলামেশার ক্ষমতা আয়ত্ত করাবার প্রশস্ত উপায় হচ্ছে ছেলেবেলা থেকে মেলামেশার অভ্যাস করানো। ইংরাজরা ছেলেদের আদবকায়দার বিষয় খুব সচেষ্ট ও সজাগ। আমরা তা নই বলে আমাদের অধিকাংশ ছেলে বাইরের লোক সম্বন্ধে হয় বেশি বাচাল ও বেচাল কিংবা বেশি সংকুচিত ও ভীত হয়। বড়োরাও যে সে দোষমুক্ত, তা নয়। এ-সব কেবল অনভ্যাসের ফল— এবং তার প্রতিবিধান বাপমায়েরই হাতে। লোকসমাজে স্বীয় সন্তানগণ যাতে সহজ সদয় সুরুচিপূর্ণ সংযত ও স্বদেশীভাবানুমোদিত ব্যবহার করতে শেখে, এই পঞ্চ 'স'কারের দিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ইংরাজিতে 'lady' ও 'gentleman' শব্দে ভদ্রব্যবহারের যে উচ্চ আদর্শ সূচিত করে, তা রক্ষা করে চলতে পারলে নৈতিক উপদেষ্টার আর বড়ো কিছু বলবার বাকি থাকে না।

আমাদের দেশে রাজদরবার ছিল না বলে, কিম্বা যে কারণেই হোক, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের একটু অভাব লক্ষিত হয়। উচ্চনীচ সম্বন্ধ ব্যতীত সমকক্ষ মেলামেশার সকল অবয়ব যেন এখানে সম্পূর্ণ নয়। অপর জাতের সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা হলে সাধারণ অভিবাদনের কোনো নির্দিষ্ট রীতি নেই; আত্মীয় ভিন্ন অপর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করবার কোনো শিষ্ট

প্রথা নেই। কিম্বা আগে থাকলেও, এখন লোপ পেয়েছে। এ-সকল অভাবমোচন বা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা একালের মেয়েদের একটি কর্তব্য কাজ। অন্যান্য বিষয়েও যেমন, এ-সব বিষয়েও তেমনি আমরা দায়ে পড়ে ইংরাজি সভ্যতার শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে ইংরাজদের নকল করাটা, বিশেষত সামাজিক ক্ষেত্রে, মোটেই শোভন বা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এতদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ বেশি পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি একলা ঘরে বসে একটা মন-গড়া নিয়ম মানলেই তো যথেষ্ট হল না। দশজনকে যদি সঙ্গে নিতে চাই তো, সাময়িক অবস্থা বুঝে যা রয় সয় এমন নিয়ম চালাবার চেষ্টা করতে হয়। যা কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে চিরবিলুপ্ত, তীরে বসে বসে তাকে পুনরুদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না করে, এখনও যেটুকু দেশীয়তা প্রচলিত আছে, সেটুকু যাতে নব্যভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে, সেইদিকেই লক্ষ রাখা উচিত। যথা, ব্রাহ্মণের প্রাপ্য অভিবাদন সব জাতেই যেন সমানভাবে পায়, 'শ্রীমতী' ও 'দেবী' প্রভৃতি সম্মানার্থক সম্বোধনই যাতে সমাজে প্রচলিত হয়, ইত্যাদি।

আত্মীয়তার বাইরেই ভদ্রতার পূর্ণপ্রকাশ ও প্রয়োজনীয়তা যেমন উপলব্ধি করা গেল, তেমনি সেই বাইরের সমাজে আবার কথোপকথনের ক্ষেত্রেই তার চরম বিকাশ লক্ষিত হয়; কারণ, ক্ষণিক মেলামেশার সংকীর্ণ অবকাশে পরস্পরের জন্য হাতে-কলমে বিশেষ কিছু করবার সুযোগ কমই পাওয়া যায়। স্ত্রীলোককে পুরুষমানুষে যে ছোটোখাটো সাহায্যগুলি করতে পারে ও করলে ভালো দেখায়, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে তারও বিশেষ আবশ্যক হয় না— অবশ্য বয়সের বেশি তফাত না থাকলে। কিন্তু সমবয়সী ও সমকক্ষ পুরুষসমাজের কথোপকথনস্থলেও

আমাদের কতকগুলি জাতীয় দোষ প্রকাশ পায়, যা সংশোধন করতে পারলেই ভালো। মেয়েরাও সে দোষ-বর্জিত নন। প্রথমত, আমরা প্রায় সকলেই বেশি চেঁচিয়ে কথা কই; দ্বিতীয়ত, তর্কস্থলে আমরা অধিকাংশ লোকেই চটে গিয়ে কূটতর্ক, জিদ বা ব্যক্তিগত খোঁটার আশ্রয় নিই; তৃতীয়ত, আমরা অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে অধীরভাবে মাঝে বাধা দিয়ে কথা বলি (হিত অথচ মনোহারী বাক্যের চেয়ে কি মনোযোগী অথচ সমঝদার শ্রোতা বেশি দুর্লভ নয়?); চতুর্থত, আমরা নিজের উপস্থিত ইচ্ছামত কথা বলে যাই, শ্রোতা বুঝে কথার বিষয় এবং মাত্রা নির্ধারণ করি নে। আমার শরীরের অসুখ বা মনের ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ যে সকলের রুচিকর না বোধ হতে পারে সে কথা ভুলে যাই, এবং অন্যকে কথা বলবার বা মতামত ব্যক্ত করবার অবসর দিই নে। ফলে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের গল্পগোষ্ঠী হয় একটা গোলে-হরিবোলে পরিণত হয়, যেখানে সকলেই একসঙ্গে বলে, কিন্তু কেউ শোনে না; কিম্বা ইংরাজিতে যাকে বলে 'one-man-show' তাই হয়, অর্থাৎ একজন মাত্র বক্তা, আর সকলে শ্রোতা। অথচ আসলে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা বা সমালোচনাই সামাজিক মেলামেশার প্রধান সুখ ও সুফল। পঞ্চমত, আমরা জেনেশুনে এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করি যা উপস্থিত লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর, অথবা এমন করে কথা বলি যাতে তাদের কারও মনে লাগতে পারে; ভাষায় যাকে বলে 'ঠেস দিয়ে কথা বলা'। দরকার কি? ভদ্রতা যদি নীতি না হয় তো ভদ্রসমাজও নীতি-উপদেশ বা শাসনদণ্ডের স্থান নয়। বেশি শাসন করতে চাও সমাজ থেকে তাড়াও; কিন্তু যে যতক্ষণ সমাজে আছে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করো। অভদ্রতা না করেও বোধ হয় একজনকে বোঝানো যায় যে তাকে আমার

বড়ো পছন্দ নয়, এবং সময়ে সময়ে তা বোঝানো আবশ্যকও হয়ে পড়ে ; কিন্তু এগুলি ভদ্রতার ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। কবিতা যদি 'কী-যেন-কী'র উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তো সমাজকে মনে করো 'যেন'র উপর প্রতিষ্ঠিত ; মনে মনে যার যাই থাক্, লোকসমাজে এমন ভাবে চলো যেন সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঠিক আছে, যেন তোমাকে দেখে আমি ভারি খুশি হয়েছি, যেন তোমার জন্য এ কাজটুকু করে দিতে পারায় তোমার নয়, আমারই লাভ। আর ভেবে দেখতে গেলে সেটা এমনই বা শক্ত কি ? কেনই বা শুধু মৌখিক হবে? আত্মীয়তাস্থলে ভালোবাসার অভাব ভদ্রতায় পূর্ণ করা শক্ত বটে ; কিন্তু অনাত্মীয়ক্ষেত্রে ভদ্রতা বিনয় নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ক্ষণকালের জন্যেও ভূষিত হওয়া তো সহজ বলেই বোধ হয়। পর যখন এত অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়, তখন সেটুকু তার জন্য না করাটাই আশ্চর্য, করায় কিছু বাহাদুরি নেই। অর্থ বা মানের দম্ভে যাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন ও মানুষকে মানুষজ্ঞান করেন না, তাঁরা ভুলে যান যে মানুষ নইলে মানুষের একদিনও চলে না এবং চিরদিন কারও সমান যায় না।

পরিশেষে আবার বলি যে ভদ্রতা সর্বরোগের মহৌষধ না হলেও, এবং তার প্রসার বা গভীরতা বেশি না থাকলেও, তা ঘরে বাইরে অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্য-কর্তব্য— শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। এক দিনের জন্যেও যদি ভদ্রতা সমাজ থেকে ছুটি নেয়, তা হলে কী ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়, তা মনে করতেও কি হৃৎকম্প হয় না ? এক হিসেবে ভদ্রসমাজের সকলেই যেন একটি পাতলা বরফখণ্ডের উপর নৃত্য করে বেড়াচ্ছে— পায়ের তলায় একটু ভাঙলেই অতল জলে মজ্জমান হবার সম্ভাবনা ; কিন্তু ভাগ্যক্রমে

সহজে ভাঙে না। এই ধূলিম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে মোলায়েম করে এনে দৈনিক জীবনযাত্রার যাতে একটু শ্রীসম্পাদন করতে পারি, সকলেরই কি সেই চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কেউ এর আনুষ্ঠানিক কর্তব্য থেকে রেহাই পেতে পারে তো সে কেবল সেই-সকল অসাধারণ লোক, যাঁরা এমন কোনো বৃহৎ কাজ বা মহৎ চিন্তায় লিপ্ত আছেন যাতে সমাজের ছোটোখাটো আদেশ পালন করবার সময় পাওয়া অসম্ভব এবং সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকতে হয়, যাঁরা সংসারে থেকেও সংসার ও সমাজকে অতিক্রম করেছেন। শুধু ভদ্রতার দ্বারা বড়ো কাজ কিছু হবে না সত্য, কিন্তু ছোটো নিয়েই তো আমাদের অধিকাংশের অধিকাংশ জীবনের কারবার— ছোটো কাজ, ছোটো কর্তব্য ছোটো সুখ, ছোটো দুঃখ। আমাদের বড়ো বড়ো ঋষিরাও তো প্রার্থনা করেছিলেন— যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো।

পাটেল-বিল

পাটেল-বিল সম্বন্ধে যে দেশব্যাপী আন্দোলন উঠেছে, তার ফলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে-ক'টি কথা উদয় হয়েছে, সেগুলি পরিষ্কার করে লেখবার ইচ্ছা হতে এই প্রবন্ধ প্রসূত।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি সে বিলের ধারাগুলি চোখে দেখি নি; শুধু কানে শুনে শুনে এইটুকু বুঝেছি যে, সেটি হচ্ছে অসবর্ণ হিন্দু-বিবাহকে আইনসিদ্ধ করবার একটি পাণ্ডুলিপি। তাতেই যখন এত গোলযোগ উপস্থিত, তখন ইংরাজ-রাজ অসবর্ণ বিবাহ অবশ্যকর্তব্য বলে আইন জারি করতে উদ্যত হলে না জানি কী হত! অনুজ্ঞা এবং অনুমতির প্রভেদ কি এতই সূক্ষ্ম? বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তো বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র-সম্মত প্রমাণান্তে আইনসংগত করে গেছেন, কিন্তু তার ফলে হিন্দুসমাজে ক'টা বিধবাবিবাহ হয়েছে? জাতিভেদবুদ্ধি ও পূর্বসংস্কার আমাদের এতই মজ্জাগত যে, বাইরের নিষেধ রহিত হলেও, ভিতরের অপ্রবৃত্তি যে শীঘ্র প্রবৃত্তিতে পরিণত হবে. সে ভয়ও নেই, সে ভরসাও নেই।

তবে যে জনসাধারণে এই অনুমতির প্রস্তাবনায় এত বিচলিত হয়ে পড়েছে, তার কারণ, বিবাহসম্বন্ধই সমাজের মূলভিত্তি, তারই নিয়মে সমাজ 'বিধৃতস্তিষ্ঠতি'। তাই বিবাহের প্রচলিত প্রথায় একটুও ঢিলে পড়বার কথা শুনলেই সামাজিক জীবের মন স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে ওঠে— কার্য-কারণ-জ্ঞান তখন আর ততটা টন্‌টনে থাকে না।

আমার মনে হয় বিবাহসম্বন্ধকে তিন দিক থেকে মিলিয়ে দেখলে তবে সম্পূর্ণভাবে দেখা হয়— ধর্মের দিক, সমাজের দিক, এবং আইনের দিক। এই তিন দিক পরস্পরসম্বন্ধ বলেই এ-বিষয় সুস্পষ্ট ধারণা বা

আলোচনা করা এত শক্ত। তার উপর একটা কবিত্বের দিক আছে, সেটা নাহয় এখন ছেড়েই দিলুম, কারণ হিন্দু-বিবাহে তাকে বড়ো একটা আমল দেওয়া হয় না। সেকালে স্বয়ম্বরা হত শুনেছি, কিন্তু এখন তো কবিত্ব বিত্তরাহুগ্রস্ত এবং রুচি শুচিবায়ুগ্রস্ত।

ইংরাজ-রাজ কেবল আইনের দিক থেকেই হিন্দু-বিবাহে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, তা ভিন্ন আর কোনো দিক থেকে তাঁরা এতে লিপ্ত হতে চানও না, পারেনও না। পাটেল-বিলের যখন বিচার হবে, তখন খুব সম্ভব দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক যেদিকে ঝোঁক দেবেন তাঁরা সেইদিকেই রায় দেবেন। কিন্তু আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান দেশ-কালপাত্র সবই এইসঙ্গে জড়িত; কাজেই আমরা প্রত্যেকে হয় এর সপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ দলে ভর্তি হতে বাধ্য। এবং তা হতে হলেই আগে উভয় পক্ষ বুঝে দেখা দরকার। যদিও দলাদলিটা প্রায় না-বোঝার দরুনই হয়ে থাকে।

প্রতিপক্ষ বলেন— এরকম কাজে অনুমতি দেওয়াও অন্যায়। কিন্তু কাজটা ভালো কি মন্দ, সমাজের পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গলজনক, সেই নিয়েই তো সমস্ত তর্ক। এবং এ তর্কের মীমাংসা জাতীয় প্রথা ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি উভয়ের সংযোগ হলে তবেই সুসিদ্ধ হবে। অসবর্ণ বিবাহ সেকালের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না জানি নে। অগাধ শাস্ত্র-সিন্ধুর অসংখ্য টীকাভাষ্য মন্থন করলে বোধ হয় না মেলে হেন মত নেই। তবে গীতায় 'বর্ণসংকর'কে মানুষের দুর্দশার চরম সীমা বলে যেরকম ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাতে অন্তত সে সময়ে অসবর্ণ বিবাহকে দূষণীয় মনে করত, এটুকু বোঝা যায়। আর সে ভাব আত্মাভিমানী জেতৃজাতির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, যেখানে তারা বিজিত দেশজ

জাতিকে হেয় মনে করে, এবং নিজেদের আভিজাত্য রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়। শ্বেতব্রাহ্মণ ইংরাজদেরও তো এই মনোভাব; এবং শ্বেতকৃষ্ণের বর্ণসংকর পৃথিবীর কোনো সমাজেই সমাদৃত নয়। একদিকে দেখি গীতার এই প্রতিকূলতা, আবার ওদিকে শুনি শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের বিধি, অথচ প্রতিলোম বিবাহের নিষেধ আছে। এই নানা মুনির নানা মত-সংকুল শাস্ত্রবিচার ছেড়ে একালে এলে দেখা যায় যে, লোকাচার অসবর্ণ বিবাহের সম্পূর্ণ প্রতিকূল; এবং বর্তমান হিন্দুসমাজ যে-ভাবে বিধিবদ্ধ, অসবর্ণ বিবাহ একেবারে তার মূলে কুঠারাঘাত করে। কারণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ আর যাই হোক, জাতিভেদ-প্রথা যে তার মধ্যে সর্ব-প্রধান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন-কি, সে প্রথা লোপ পেলে— হিন্দুধর্মের না হোক— হিন্দুসমাজ বা হিঁদুয়ানির আর কিছু অবশিষ্ট থাকে কি না সন্দেহ; হিন্দুর ধর্মে কর্মে আচারে অনুষ্ঠানে মতে বিশ্বাসে জাতিভেদ এমনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যাঁরা বাহ্যিক বা আন্তরিকভাবে হিন্দুসমাজভুক্ত থাকতে চান তাঁরা যে প্রাণপণে হিঁদুয়ানির এই শেষ খোঁটাটিকে আঁকড়ে থাকতে চাইবেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। হিন্দুর ধর্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম, তার গৌরব অগৌরব সবই ব্রাহ্মণ্যের সঙ্গে লিপ্ত। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সবই তো শুনি ব্রাহ্মণের জন্য; অব্রাহ্মণে কী করে না করে তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। জাতিভেদ যদি সর্বতোভাবে লুপ্ত হয় তো ব্রাহ্মণত্বও লোপ পাবে। ব্রাহ্মণের প্রায় সব বিশেষত্ব নষ্ট হয়েও যে আজও হিন্দুসমাজ টিঁকে আছে, সে কেবল এই জাতিভেদ-প্রথার গুণে বা দোষে। সুতরাং যাঁরা সনাতন হিন্দু-সমাজরক্ষার পক্ষপাতী, তাঁরা যে পাটেল-বিলের বিপক্ষ হবেন, সে তো ধরা কথা।

ওদিকে যাঁরা সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজ-নিরপেক্ষ, তাঁদের পাটেল-বিলের পক্ষে দাঁড়াবার বিশেষ কোনো কারণ নেই। কারণ তাঁরা Act III of 1872 অনুসারে 'হিন্দুধর্মাবলম্বী নই' বলে অসবর্ণ বিবাহ স্বচ্ছন্দে করতে পারেন এবং করেও থাকেন। বরং এই কারণে একটু বিপক্ষ. হতে পারেন যে, হিন্দুসমাজে থেকেই যদি অসবর্ণ বিবাহ করা যায় তো লোকের অহিন্দু হবার সম্ভাবনা কমে যেতে পারে।

বাকি রইল সেই তৃতীয় দল, যাঁরা বর্তমান হিন্দু সমাজের সব আইন-কানুনে আবদ্ধ থাকতে রাজি নন, অথচ নিজেদের 'অহিন্দু' বলতেও আপত্তি বোধ করেন। কারণ, বলা বাহুল্য যে, 'হিন্দু' বলতে ধর্ম সমাজ এবং জাতি এই সবই বোঝায়; এবং যাঁরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ আংশিকভাবে ত্যাগ করতে প্রস্তুত তাঁরাও ঐতিহাসিক হিন্দুজাতিভুক্ত নন বলতে নিতান্তই নারাজ। যতই স্বাধীনচেতা হও-না কেন, মানুষ একলা নিজের পদযুগেমাত্র ভর করে দাঁড়াতে পারে না; অথবা তার শরীরের পক্ষে সেই জঙ্গম খুঁটিদ্বয় যথেষ্ট নির্ভর হলেও তার সর্বভুক মনের পক্ষে ভূতভবিষ্যৎবর্তমানব্যাপী কাল এবং বিশ্বব্যাপী দেশের মধ্যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে নিজেকে অঙ্গীভূত বোধ করা বিশেষ আবশ্যক। আমার নিজের জানত দুটি-তিনটি সম্বন্ধ কেবল এই 'অহিন্দু' বলবার আপত্তির দরুন ভেঙে গেছে। প্রথম যখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন -প্রমুখ ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মবিবাহ-আইন পাস করাতে চেয়েছিলেন, তখন বাধা না দিলে অন্তত ব্রাহ্মদের পক্ষে এই পথ সুগম হয়ে যেত; কিন্তু তখনও বোধ হয় সময় হয় নি। তার পরে মান্যবর ভূপেন্দ্রনাথ বসুরও এই প্রকার আইন পাস করাবার চেষ্টা বিফল হয়েছে। দেখা যাক এবার পাটেল মহোদয়ের এবং আমাদের অদৃষ্টে কী আছে। কাল পূর্ণ হলে অসাধ্যও সাধ্য হয়!

এই আইন পাস হলে বলছিলুম সেই সংকীর্ণ দলেরই সুবিধে হবে, যাঁরা 'হিঁদু' না হয়েও হিন্দু থাকতে চান। আদিব্রাহ্মসমাজ এই দলের অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত হিন্দুসমাজের সঙ্গে প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধেই তাঁদের মতদ্বৈধ, আর-সব বিষয়ে তাঁরা মোটামুটি একমত। যতদিন তাঁরা আচারে ব্যবহারে তাৎকালিক হিন্দুসমাজের বেশি বিরুদ্ধাচরণ না করবেন ততদিন হিন্দুসমাজ তাঁদের বহিষ্কৃত করবার জন্য বেশি ব্যস্ত হবে না বোধ হয়; কারণ হিন্দুধর্মের অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে খুঁজলে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক যে না পাওয়া যায় তা নয়। তাই এই মতভেদ কার্যত তত পার্থক্য ঘটায় নি; একই পরিবারের এক মেয়ের হয়তো হিন্দুমতে, আর-এক মেয়ের আদিব্রাহ্মমতে বিয়ে হয়েছে, এমন দেখা গেছে। শেষোক্ত বিবাহস্থলে শালগ্রাম সাক্ষী থাকেন না এবং হোম বাদ দেওয়া হয়, তা ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই; তাই মিলেমিশে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আদিসমাজ যেমন এই সাকার-নিরাকার পূজা সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছেন, অথচ হিন্দু-জাতিভুক্ত থাকতে চেয়েছেন, পাটেলপন্থীরাও তেমনি জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেও হিন্দুজাতিভুক্ত থাকতে চান। দুই দলের মিল এই যে, দুজনেই হিন্দুজাতিভুক্ত থাকতে ইচ্ছুক; তফাতের মধ্যে দুটি ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রচলিত হিন্দুসমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করতে চান। এই মিলটুকুর জন্য তাঁরা দুজনেই সাধারণ সমাজে মিশে যেতে অক্ষম। তবে যদি জাতিভেদপ্রথার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজ সত্য সত্যই জন্মান্তরগ্রহণ করে, তা হলে আদি ও সাধারণে, পাটেল এবং অপাটেলে, ক্রমশ কিছু প্রভেদ থাকবে কি না, তা অনুবীক্ষণ-সাপেক্ষ। দুই দলের মধ্যে আর-একটি মিল এই যে, প্রচলিত হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে

যেতে গিয়ে তাঁরা অপ্রচলিত প্রাচীন হিন্দুত্বের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। অন্তত আদিসমাজ তো অতীতে ঠেলে গিয়ে উপনিষদ পর্যন্ত পৌঁছেছেন; তবে পাটেলপন্থীগণ মনুর দোহাই দিচ্ছেন কি না, ঠিক বলতে পারি নে।

দ্বন্দ্বটা কি শেষে হিন্দুজাতি এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়? আমি উচ্চৈঃস্বরে বলতে পারি যে, আমি হিন্দু। ইংরাজরাজও তাঁর আইনের সীমানা পর্যন্ত আমার কথার সমর্থন করতে পারেন, এবং পেয়াদার বডিগার্ড দিয়ে আমার নাতির বিষয়ের অংশ পাহারা দিতে পারেন। কিন্তু তার বাইরে যে বিস্তৃত হিন্দুসমাজ পড়ে আছে— যেখানে ইংরাজের প্রবেশ নিষেধ, যেখানে আমার আত্মীয়তা, যেখানে আমার কুটুম্বিতা. যেখানে আমার শতসহস্র মঙ্গল বন্ধন ও সুখদুঃখ জড়িত; সেখানকার সকলে যদি আমাদের নবদম্পতিকে আদর করে ঘরে তুলে না নেয়, হাসিমুখে বরণ না করে, তা হলে কি শুষ্ক বিলের খড়খড়ানিতে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা হবে? সমাজের হিসেবে তো বললুম আদিসমাজ একরকম তরে গেছে; আইন হিসেবেও বোধ হয় তরে যাবে, যদি কখনও আদালতে বিচার হয়; কারণ ইংরাজ-আদালত বিবাহ অসিদ্ধ করতে কুণ্ঠিত। তবে তার জাতভাই পাটেল-বিল আরও দুর্গম পথের পথিক। আমার বক্তব্য শুধু এই যে আইন হিসেবে যদিও পাটেল-বিল তরে যায়, তবু সামাজিক হিসেবে যতদিন না তরবে, তাকে সম্মানসহ উত্তীর্ণ বলতে পারা যাবে না। বিবাহের ত্রিমূর্তির সমন্বয় হওয়া চাই, এই বিল-অনুসারে বিবাহিত অসবর্ণ দম্পতিকে হিন্দুসমাজের আপনার লোক বলে মেনে নেওয়া চাই, তবেই এই বিল সম্পূর্ণ সার্থক হবে। অবশ্য প্রথম থেকেই সে আশা করা যায় না, এবং সমাজের ভ্রূকুটির ভয়ে

আমি কাউকে অসবর্ণ হিন্দু-বিবাহ থেকে নিরস্ত হতেও বলি নে। বোম্বাই প্রদেশে দেখেছি বিধবা-বিবাহকারীদের একরকম মহাপুরুষ বলে লোকে গণ্য করে এবং সকলের সঙ্গে সেই হিসেবে আলাপ করিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম পাটেল-বিবাহিতরাও বোধ হয় এ দেশে স্বনামধন্য হবেন। ক্রমে ক্রমে এইরকম বিয়ে লোকের সয়ে আসবে, তার পরে হিন্দুসমাজেও গ্রাহ্য হয়ে যাবে; তখন আর তা করায় কোনো বাহাদুরি থাকবে না। ইতিমধ্যে যাঁরা নাম করতে চান, তাঁরা অগ্রসর হোন। অবশ্য আগে বিলটা পাস হয়ে যাক!

কে না জানে যে, সমাজ গঠন ও রক্ষার জন্য নিয়ম পরমাবশ্যক, এবং নিয়ম মানেই বাধা। শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য যে পরিমাণ নিয়ম আবশ্যক, তা কেউ ভেঙে দিতে বলছে না। বলছি শুধু 'জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা, আচারে বিচারে বাধা'র লৌহ-কারাগারমুক্ত করে হিন্দুসমাজকে সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ফিরিয়ে দিতে, তাকে পৈতৃক সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, অহল্যাপাষাণীতে প্রাণ সঞ্চার করতে। কিন্তু কোথায় সে দূর্বাদলশ্যাম মোক্ষদ শ্রীরাম।

কলিযুগে যে তিনি পাটেলরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাও বলি নে; এবং এই বিল পাস হলেই যে আমরা এক লম্ফে উন্নতির চরম শিখরে আরূঢ় হব, তাও মনে করি নে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতলক্ষ্মীর যে শতদলপদ্মাসীনা মহিমময়ী মূর্তি কল্পনাচক্ষে দেখতে পাই, এই নব-বিবাহপদ্ধতি তার একটি দল মাত্র। কিন্তু একটি একটি করেই দল খুলবে. দুইটি তিনটি করেই ক্রমে শত পূর্ণ হবে; তাই একটির 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ'।

একটি দলে যেমন পদ্ম হয় না, তেমনি একটি লোকেও সমাজ হয় না,

সেই তো মুশকিল। একজনের মতে নতুন সমাজ গড়তে পারে বটে, যদি সে একাই একশো হয়। একে একে এমন অনেক মহাপুরুষই আমাদের পাশমুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। এক-একটি গ্রন্থি খুলেও দিয়ে গেছেন; তবে এখনও অনেক বাকি। এ পর্যন্ত প্রায় সকলেই ধর্মের নামে এই অসাধ্যসাধন করেছেন; কিন্তু যেরকম দিনকাল পড়েছে তাতে ভবিষ্যৎ-চোরা সে কাহিনী আর শুনবে বলে ভরসা হয় না। এখন দেশ কতকটা সেই স্থান অধিকার করেছে; 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে মরাগাঙেও বান এসেছে। আগে নিজের আত্মার মুক্তির জন্য যে উৎসাহের প্রয়োগ হত, তার কিয়ৎপরিমাণও দেশাত্মবোধে নিয়োজিত হলে কালে দেশোদ্ধার হতে পারে। বাইরের চাপে বিদেশের শিক্ষায় আমাদের কতকগুলো বাধা ভেঙেছে, কতকপরিমাণ চৈতন্য জন্মেছে— এক হবার, স্বাধীন হবার, উন্নত হবার দিকে একটা তাড়না ও প্রেরণা এসেছে। বাকিটা কি নিজের ভিতর থেকে হবে না? হিন্দুসমাজ কি বুঝবে না যে, ভেদের কাল গিয়েছে, সাম্যের দিন এসেছে; কেউ আর অধীন থাকতে চায় না, কারণ 'সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে'। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যেমন রাজার কাছ থেকে স্বরাজ চাচ্ছি, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও যে এতদিন মূক ছিল সে ভাষা শিখেছে, যে বধির ছিল সে শুনতে পাচ্ছে, যে অন্ধ ছিল সে আলো দেখেছে, যে পায়ের তলায় পড়ে ছিল সে উঠে বসতে চাচ্ছে; এই বেলা যদি উচ্চ জাতি পুরাতন কৃত্রিম ব্যবধান সরিয়ে ফেলে আপনি নেমে আসে ও সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশে যায়, সাধারণের হিতের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মবিসর্জন করে, অসার পদমান স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তো ভালো— তাদেরই পক্ষে ভালো; নইলে অচিরে তাদের মান ধুলোয় লুটবে, সেইসঙ্গে প্রাণ নিয়েও

টানাটানি পড়তে পারে। এখনই তো তাই ঘটছে, এখনই তো হিন্দু-সমাজ মৃতপ্রায়। কেবল বহিষ্করণ, কেবল তিরষ্করণ, কেবল জাতিপাত ও দলাদলি করে ভালো লোক, শিক্ষিত লোক, কৃতী লোককে বর্জন করতে থাকলে, ক'দিন হিন্দুসমাজ টিঁকবে, কাকে নিয়ে দশজনের মধ্যে একজন হবে? সংকীর্ণতা দূর করুক, কড়াক্কড় নিয়ম শিথিল করুক; কিসে হিন্দুয়ানির বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব তাই বিচারপূর্বক রক্ষা করুক, যাতে তার ক্ষয়ক্ষতি, যা কালের অনুপযোগী, উন্নতির বিরোধী, তাই বর্জন করুক; তবে তো জাত গেলেও জাতি রক্ষা হবে।

প্রতিপক্ষের প্রধান যুক্তির মধ্যে একটি এই যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করেন নি তার কারণ তাঁরা জানতেন যে, ভিন্ন জাতির বিবাহ সন্তানের অবনতির কারণ, এবং এ মত আজকালকারও বিজ্ঞানসম্মত। এ বিষয় বিশেষজ্ঞই মত দিতে সমর্থ, তবে বাজে লোকের সহজ বুদ্ধিতে এই উত্তর প্রথমেই মনে আসে যে, যখন বর্ণে বর্ণে প্রকৃত প্রভেদ ছিল, তখন এ কথা খাটলেও খাটতে পারত। কিন্তু একালে কুলজি ছাড়া যখন অধিকাংশ লোকেরই জাতিবাচক কোনো প্রমাণ বা লক্ষণ নেই বললেই হয়, তখন এ কৃত্রিম প্রভেদ বজায় রাখবার বৃথা চেষ্টায় কেন স্বাভাবিক ঐক্য নষ্ট করি, এবং অকারণ অহংকারের প্রশ্রয় দিই? বৈদ্যজাতি সংকীর্ণ বর্ণ বলে কি কোনো অংশে অপর উচ্চজাতির চেয়ে হীন? হতে পারে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে জাতিবৈষম্য বেশি প্রত্যক্ষ, কিন্তু বাংলাদেশের সামান্য অভিজ্ঞতাই আমার সম্বল। অনেক ব্রাহ্মণ যেখানে বিদ্যাবিনয়শূন্য, অনেক ক্ষত্রিয় যেখানে বলবীর্যহীন, অনেক বৈশ্য যেখানে বাণিজ্যব্যবসানভিজ্ঞ, এবং অনেক শূদ্র যেখানে উচ্চতর কোনো জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়— সে

অবস্থায় আর প্রাচীন ব্যবধানকে ঠেকো দিয়ে রাখবার কি কোনো আবশ্যক বা অর্থ আছে? যেমন সগোত্র বিবাহ যেকালে নিষিদ্ধ হয়েছিল, তখন হয়তো এক পরিবারভুক্ত লোকের বিবাহনিবারণের স্বাভাবিক কারণ বর্তমান ছিল; কিন্তু একালে এই অভাবপীড়িত অন্ন-চিন্তাক্লিষ্ট কন্যাদায়গ্রস্ত সমাজে কি তার মতো নিরর্থক নির্বোধ নিয়ম আর দুটি আছে? অথচ এই কাল্পনিক অসংগত অনুচিত বাধা দূর করবার জন্য আমরা কেউ বদ্ধপরিকর হই নে। আমার তো মনে হয় অসবর্ণ বিবাহের ঢের আগে সগোত্র বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করা উচিত। মৃত্যুর আগে কি আমরা এই-সব 'বাসাংসি জীর্ণানি' পরিত্যাগ করব না?

আর-একটি যুক্তি এই যে, যাঁরা অসবর্ণ বিবাহ করবেন, তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া বড়ো শক্ত হবে। তা তো হবেই, সে তো তাঁরা জেনে বুঝেই করবেন। যে-কোনো ব্যক্তি কোনো নতুন হিতকর্মে অগ্রগামী হবেন, সমাজের কোনো উন্নতির পথপ্রদর্শক হবেন, তাঁর কপালে তো দুঃখ আছেই। তবে অগ্রসর হন কেন? সেইসঙ্গে মহত্ত্বের রাজটীকা এবং বীরত্বের জয়মাল্য জড়িত আছে বলে। পরে যারা আসবে তাদের পথ সুগম হবে বলে। বদলের মুখে অসুবিধে কষ্ট, এমন-কি, বিশৃঙ্খলা অরাজকতা, সবই হবে; কিন্তু তাই বলে তো চিরকাল এক জায়গায় বসে থাকা যায় না, তা ভাবতে গেলে তো কোনোকালে চলাই হয় না। ভাবতে শুধু হবে যে, এ পথে চলা উচিত কি না, দেশের ও দশের পক্ষে ভালো কি না। তার পরে কালে বিশৃঙ্খলার জায়গায় সুশৃঙ্খলা, অসুবিধার স্থানে সুবিধা আপনি প্রকাশ পাবে। নতুন ব্রাহ্মদের কি কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল? কিন্তু এখন তো হিন্দু ও ব্রাহ্ম অক্লেশে পাশাপাশি ঘর করছে।

আর-একটি যুক্তি এই যে, এ বিল পাস হলে ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে মনে করে দেশের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হবে এবং একজন দেশীলোক এই বিলের জনয়িতা মনে করে স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী হবে। কিন্তু ধর্মে হস্তক্ষেপ তো করা হচ্ছে না। জোর করে দেশের লোককে কিছু করতে তো বলা হচ্ছে না। শুনতে পাই যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আইনের মূলে একটি প্রভেদ আছে; সেটি হচ্ছে এই যে, পশ্চিমদেশে আইন গড়া রাজার কার্যের মধ্যে গণ্য, কিন্তু পূর্বদেশে আইন গড়া ছিল প্রজার কার্যের মধ্যে গণ্য। এখন অবশ্য সে স্বাভাবিক ক্ষমতা আমাদের গেছে। ইংরাজ-রাজ এ দেশে এসে কতকগুলি বিভাগে নিজের আইন জারি করতে বাধ্য হয়েছেন, নাহলে হয়তো শাসনতন্ত্রের ঐক্যরক্ষা দুঃসাধ্য হত কিন্তু সমাজ ও ধর্ম সংক্রান্ত আইনে তাঁরা পারতপক্ষে হস্তক্ষেপ করেন নি। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ যদি তাঁদের আইনে অবৈধ বলে ধার্য হয়ে থাকে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকি তাই হয়েছে) তা হলে পুনশ্চ তাঁদেরই আইন দ্বারা বৈধ করে নেওয়া ভিন্ন উপায় কি? যিনি একবার 'না' বলেছেন, তিনিই আবার 'হাঁ' বলবেন বৈ তো নয়!

আমাদের সমাজের যদি নিজের অবস্থা বুঝে নিজে ব্যবস্থা করবার সামর্থ্যই থাকবে, তবে আমরা ব্যবস্থাপত্রের জন্য রাজদ্বারে হাত পাততে যাব কেন? কিন্তু বর্তমান হিন্দুসমাজের নেতা কই, ব্যবস্থাপক সভা কই? পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন স্বাভাবিক নেতা, গুরু ও চালক; কিন্তু এখন তো শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সভা করেন শুধু অন্ধভাবে সমাজবন্ধন কষবার জন্য এবং অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পয়সার লোভে সবরকম ব্যবস্থাই দিতে প্রস্তুত। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের মতো আমরা জন্মান্ধ নই, কিন্তু গান্ধারীর মতো স্বেচ্ছান্ধ হওয়াই মনে করি পরম পুরুষার্থ। তা ছাড়া হিন্দুসমাজ এত বিপুল

জটিল ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে যে, কোনো-এক দলের পক্ষে তাকে সমগ্র-ভাবে নড়ানোর চেষ্টা বৃথা শক্তির অপব্যয়; সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে যেমন এক মহা রাষ্ট্র হওয়া শক্ত, তেমনি সমগ্র হিন্দুসমাজকে এক ছত্রের অধীন করাও দুষ্কর; স্বতন্ত্র রাষ্ট্রেই দেশ এবং সমাজকে বিভক্ত করতে হবে, তবে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্র বা United States হলেই ভালো। খণ্ড খণ্ড সম্প্রদায়ের পক্ষে নিজেদের ভিতর থেকে নিজের উন্নতিচেষ্টা করাই প্রশস্ত এবং কার্যতও তাই হচ্ছে বলেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দু-সমাজ এখনও মরে নি। ব্রাহ্মসমাজের উত্থান, একই জাতের ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের প্রচলন, নীচ জাতের অবমাননাবোধ ও উন্নতিচেষ্টা, বিবাহ-পণসম্বন্ধে আন্দোলন প্রভৃতি জীবনের লক্ষণ আশাজনক। জীবনীশক্তির প্রধান লক্ষণ পারিপার্শ্বিক অবস্থানুকূল হবার চেষ্টাজনিত পরিবর্তন। আমাদের যুবকবৃন্দই আমাদের ভবিষ্যতের প্রধান আশা বল ও ভরসা। তাঁরা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে 'standing with reluctant feet'; বিদ্যালয়ের বিদেশী শিক্ষার স্বাধীনতার মন্ত্রের রেশ এখনও তাঁদের কানে বাজছে, জীবনসংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য শরীর-মন ছট্‌ফট্‌ করছে; কিন্তু কোন্‌ দিকে যাবেন, কোন্‌ সাধনায় আপনার তরুণ শক্তি নিয়োজিত করবেন? চার দিকে বাধা, চার দিকে নিষেধ, চার দিকে জীবনযৌবনক্ষয়কারী চাপ। রাজনীতির উচ্ছ্বাস রাজদ্বারে পরাহত, সমাজ-সংস্কারের উদ্যম পরিবারে প্রতিহত, শিক্ষার উৎসাহ অন্নচেষ্টায় পরাভূত, জীবনের আনন্দ অকালচিন্তায় পরাস্ত। কিন্তু এই বিঘ্ন অতিক্রম করেই চলতে হবে— এই তাঁদের অদৃষ্টলিপি, এই তাঁদের সাধনা। এই চাপ সরাতে হবে, এই বাধা ঠেলতে হবে, এই নিষেধ অগ্রাহ্য করতে হবে; অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য -রূপ যে দুই দৈত্য আমাদের

সোনার সংসার ছারখার করে দিচ্ছে, তাদের দেশছাড়া করতে হবে। অথচ সে কাজ করতে হবে মুখের জোরে নয়, মনের জোরে ; গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধির জোরে ; ভিক্ষার জোরে নয়, শিক্ষার জোরে। শুধু হাত তুলে মত দেখালে চলবে না, সেই হাত কাজে লাগাতে হবে। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়, সংস্কার মানে বিকার নয়, শিক্ষা মানে পাখিপড়া নয়, এ কথা তাঁদের জীবনে প্রমাণ করতে হবে, তবে তো লোকে মানবে। 'মোর জীবনে তোমার পরিচয়'। ভাব ও কাজের মধ্যে সেতুবন্ধন— এই হোক তাঁদের জীবনের উচ্চ লক্ষ্য। কাজ কঠিন, তবে অসাধ্য নয় ; যদি ব্রতের মতো গ্রহণ করেন, যদি বীরের মতো উদ্‌যাপন করেন। তার পরে যথাকালে, শুভদিনে শুভক্ষণে যখন তাঁদের শুভ-বিবাহ হবে তখন তাঁরা যেন যথার্থ সহধর্মিণী লাভ করেন, এই আশীর্বাদ করি। কিন্তু সেজন্য যে তাঁর অসবর্ণিনী হওয়া একান্ত আবশ্যক, এমন কোনো কথা নেই।

বঙ্গনারী

কি ছিল

ভূমিকাস্বরূপ পাঠিকাদের দু-একটি কথা বলে রাখতে চাই। প্রথমত, এ বিষয় আগেও অনেক কথা লিখেছি, সুতরাং মতামতের পুনরুক্তির ত্রুটি মার্জনীয়। দ্বিতীয়ত, যে সমাজের সঙ্গে আমার আবাল্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, অর্থাৎ বিলাতি শিক্ষাপ্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন সমাজ, তার কথাই সামান্যভাবে বলতে পারি; সুতরাং সব সামাজিক স্তরের বঙ্গনারী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রযুজ্য নাও হতে পারে।

ত্রিশ বৎসর! নবীনারা যদি অতকাল পিছিয়ে দেখেন তো তাঁদের অতীত জীবনের 'আধো আধো ভাষ' ও 'লহু লহু হাস' -সমন্বিত কুয়াশাচ্ছন্ন অধ্যায়ে দিশে হারিয়ে ফেলবেন; আর যদি এতদিন এগিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন তো অনাগত পাকা-চুল ও পড়া-দাঁতের ভয়ে শিউরে উঠবেন। অথচ আমাদের মনে হয় ১৯১০ সাল তো সেদিনকার কথা। মার্কামারা প্রাচীনা হবার একটা সুবিধে এই যে, আশা ভয় উভয় প্রকার উদ্‌বেগের হাত থেকেই অনেক পরিমাণ উদ্ধার পাওয়া যায়।

অবস্থার কী পরিবর্তন হয়েছে বুঝতে হলে, কী অবস্থা ছিল, সেটা জানা দরকার। যদি বঙ্গনারীর বাইরের সজ্জা থেকে বিচার আরম্ভ করা যায়, নানাপ্রকার শাড়ি পরার দস্তুর বদলে বদলে এখন যে সামনে কোঁচা দেওয়া হিন্দুস্থানী ঢঙ প্রচলিত, তার রেওয়াজ বোধ হয় ত্রিশ বৎসর আগেই সূচিত হয়েছিল। আর, আমার মনে হয়, প্রথম বিলিতি শিক্ষার ধাক্কায় একশ্রেণীর বঙ্গনারীর বেশভূষায় যে উগ্র বিদেশীয়ানার প্রভাব দেখা দিয়েছিল, বলতে গেলে, বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সে

মোহ কেটে গিয়ে স্বদেশী কাপড় ব্যবহার করবার দিকে ঝোঁক পড়েছিল ; শাড়ি জামা জুতা গয়না সব ক্ষেত্রেই দেশী নমুনা ও চালের ফ্যাশন উঠেছিল। এ স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের মেয়েরা যে পুরুষদের মতো ইংরাজি বেশের পাঁচমিশেলী অসংগত কুরুচি অম্লানবদনে অঙ্গীকার করে না নিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র নিজেদের কালোপযোগী একটা সংগত স্বদেশী সুবেশ খাড়া করে তুলতে পেরেছিলেন, সেজন্য তাঁদের সুবুদ্ধি ও সুরুচি অতীব প্রশংসনীয়।

আহার-বিহারের কথা ধরতে গেলে, মেয়েদের স্বাভাবিক স্থিতি-শীলতাবশত আমাদের এই জাতিভেদশাসিত দেশে তাঁরা অবশ্য পুরুষদের মতো অত সহজে ও শীঘ্র অহিন্দু আচারে অভ্যস্ত হতে পারেন নি। তবে যে-কালের কথা হচ্ছে, তখন অন্তত ব্রাহ্ম ও বিলাতফেরত পরিবারে খাদ্যাখাদ্যের বিচার বড়ো-একটা ছিল না। হিন্দু পরিবারেও পুরুষদের মতানুসারে জাতিধর্মে শৈথিল্য এসে পড়েছিল, কতকটা স্বেচ্ছায় কতকটা দায়ে পড়ে ঘটনাচক্রে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার নিয়মে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সূক্ষ্ম স্তরভেদের কথা ছেড়ে দিলেও, যে-কোনো যুগে স্থিতিশীল ও গতিশীল এই দুই স্থূল শ্রেণীতে সমাজকে ভাগ করা যায়। প্রথম দলের সংকেত নিষেধাত্মক তর্জনী— কোরো না, ছেড়ো না, যেয়ো না ; দ্বিতীয় দলের সংকেত প্রশ্ন চিহ্ন— কেন করব না, কেন যাব না, নতুন কিছু কেন হবে না ? ঐ সাপের ফণার মতো প্রশ্নচিহ্নটিই যত নষ্টের গোড়া— অবশ্য রক্ষণশীল মতে।

দেহসজ্জার পর গৃহসজ্জার স্থানও মেয়েদের কাছে নিতান্ত নগণ্য নয়। মামুলি বৈঠকখানা ও অন্দরমহলের ব্যবধান সেকালেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল এবং একেবারে লোপ না পেলেও দুদিকেই বিলিতি আসবাবের

নানাপ্রকার খিচুড়ি সংমিশ্রণ দেখা দিয়েছিল। ধরতে গেলে ইংরাজি শিক্ষাই আমাদের সকলপ্রকার পরিবর্তনের মূল— কি বাহ্যিক, কি আন্তরিক, কি পারিবারিক, কি সামাজিক। এবং ত্রিশ বৎসর আগে স্ত্রীশিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য আর্থিক অবস্থাও অনেক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। আর ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন যে আলোচ্য কালের বহু পরিবর্তনের প্রবর্তক, সে কথা ভুললে চলবে না। পর্দাপ্রথা, বাল্য-বিবাহ, এ-সবের উচ্ছেদ পরস্পরসাপেক্ষ, কারণ মেয়েকে শেখাতে গেলেই তাকে বেরোতে দিতে হবে এবং বড়ো বয়সে বিয়ে দিতে হবে। তার পর শিক্ষা এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ নিজস্ব মতামত হতে বাধ্য; সম্পূর্ণ নিজস্ব সুচিন্তিত মত না হোক, হাওয়ায় ভেসে আসা চলতি মতের নকলেও গড্ডলিকাপ্রবাহের কাজ চলে। ওদিকে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনদশার ফলেও অনেক পূর্বপ্রথা ধসে পড়ে স্বাধীন জেনানার দিনকাল এগিয়ে এনেছিল। সর্বোপরি আচারগত হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হওয়ায়, কতক বাইরের কতক ভিতরের আক্রমণে —যে অদৃশ্য অথচ দৃঢ় বাঁধনে এই প্রকাণ্ড জটিল সমাজকে মোটামুটি এক মতে এক পথে এতকাল বেঁধে রেখেছিল, তার একটি একটি করে গ্রন্থি খুলে গিয়ে সব আলগা ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে ক্রমশ একটি একটি করে বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে, বেশভূষা আচারব্যবহার চালচলন ধরনধারণ মতামত ও বিশ্বাসে, আধুনিক শিক্ষা স্বাধীনতা ও বিদেশীয়ানা, এই ত্র্যহস্পর্শ দ্বারা কতদূর পর্যন্ত বাঙালি মেয়েদের জীবনমন প্রভাবান্বিত হয়েছে, সেই হিসাব করতে পারলেই তাদের পরিবর্তনের কালক্রমিক গতির নির্দেশ পাওয়া যাবে।

২

উক্ত পরিবর্তন নানা প্রকারের হয়; সেগুলির কারণ বিশ্লেষণপূর্বক শ্রেণীবদ্ধ করতে পারলে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গনারীর কোন্ বিষয়ে কী পরিবর্তন হয়েছে বোঝবার ও বোঝাবার সুবিধে হবে।

আমি অন্যত্র বলেছি— রেল স্টীমার মোটর প্রভৃতি কলকারখানা ও যন্ত্রে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে; ইংরাজ-রাজের আইন-আদালত, ইস্কুল-কলেজ, আফিসের দরুন বাঙালি সমাজে যে পরিবর্তন এনেছে— এ-সব ধর্তব্যের মধ্যে নয়; কারণ এগুলি বাধ্যতামূলক এবং স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে এর ফলভোগী। কিন্তু ইংরাজ-রাজ আমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থা, আমাদের ধর্মকর্ম রীতিনীতির উপর হস্তক্ষেপ করতে নারাজ। এইখানে আমাদের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে সংস্কার বা পরিবর্তন করবার বিপুল ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, এবং এইটেকেই স্ত্রীক্ষেত্র বলা যেতে পারে।

স্থানসংক্ষেপবশত সকল পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় বা ভালোমন্দ বিচার করতে পারা যাবে না। তাই শুধু শ্রেণীগত ফিরিস্তি দিয়েই এ স্থলে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট থাকতে হবে।

১. স্বাস্থ্য ॥ পূর্বের ন্যায় সদর থেকে শুরু করলে বলতে হয় যে, গত ত্রিশ বৎসরে বঙ্গনারীর সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি বৈ উন্নতি হয় নি। ঘরে ঘরে রাস্তাঘাটে ইস্কুলকলেজে সভাসমিতিতে এর এত নিদর্শন পাওয়া যায় যে, বেশি বলা বাহুল্য। অল্পবয়সে এত চোখে চশমা, এত ঘন ঘন দন্তচিকিৎসার প্রয়োজন, প্রসবের সময় এত কষ্ট এবং ব্যয় কি সেকালে দেখা যেত? স্বাভাবিক রঙের লাবণ্য, অঙ্গসৌষ্ঠবও বিরল।

২. বেশভূষা॥ নকল রঙের প্রাদুর্ভাব, চুল ছাঁটা, ভুরু কামিয়ে আঁকা এ-সব আধুনিক প্রসাধন শুধু পরদেশের নিকৃষ্ট নকল বলেই নয়, সুন্দর গড়তে গিয়ে অসুন্দর গড়া হয় বলেই নিন্দনীয়; অন্তত আমার তো তাই মত। তবে 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ'। আগেকার আলতা পাউডার কাজলে এ উগ্রতা ছিল না।

বঙ্গনারীর বেশে বিংশ শতাব্দীর সমসময়ে স্বদেশী ঝোঁকের উল্লেখ করেছি। দুঃখের বিষয়, অন্তত এক শ্রেণী— যাদের আমাদের দেশের তথাকথিত 'স্মার্ট সেট' বলা যেতে পারে— তাদের মধ্যে এদানি আবার বিলিতি ফ্যাশনের দিকে প্রবণতা লক্ষিত হয়— যথা জর্জেট্ শাড়ি, হাই-হীল বিলিতি জুতা, ইত্যাদি। এই ফ্যাশন জিনিসটাই এ দেশে এক নতুন অনাবশ্যক উৎপাত। সাত সমুদ্র পারের কুরুচির ফ্যাশনও কি অন্ধভাবে মেনে চলতে হবে? তবে সৌভাগ্যের বিষয়, এখনও এক দল আছেন, যাঁরা স্বদেশী ও সুরুচির সমন্বয়ে নিজত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে থাকেন। আজকাল গহনার চেয়ে কাপড়ের উপরই ঝোঁক বেশি। এইখানে হাতাহীন জামা সম্বন্ধে নানা কারণে আমার ঘোর আপত্তি সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি।

৩. খেলাধুলা॥ ব্যায়াম ও খেলাধুলার প্রবর্তন এবং তার জন্য বিশেষরকম বেশ ধারণও আজকালকার পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য আনন্দ ও সৌন্দর্য লাভ যে ব্যায়াম এবং খেলার উদ্দেশ্য, তার অনুমোদন করলেও যদি তার বিশেষ বেশ বিশেষ নির্লজ্জ হয় তো সেকেলে ব'লে বদনাম কেনবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সেই সেই ব্যায়ামের চর্চা বঙ্গনারীর না করাই ভালো বলতে হবে— অন্তত প্রকাশ্যে। কারণ সেই একই বাঞ্ছিত ত্রিফল অন্যান্য অনেক সুভদ্র ব্যায়াম ও খেলায়

পাওয়া যেতে পারে। এ স্থলে পুরুষের বেশে সর্বাঙ্গীণ নকল করবার যে ফ্যাশন অতি-আধুনিকারা শুরু করেছেন, সে বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করা বাহুল্য মনে করি।

৪. আহারাদি॥ খাদ্যাখাদ্য বা ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই কমে আসছে। যদিও বিপুল হিন্দু জাতির সংখ্যানুপাতে অহিন্দু আচারীর সংখ্যা এখনও সম্ভবত নগণ্য। তবে হিঁদুয়ানির মামুলি বিচার ছাড়া স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাদ্যের সম্বন্ধরূপ আর-এক বিচারের দিকে সম্প্রতি শিক্ষিত বঙ্গনারীর মনোযোগ আকর্ষণ হচ্ছে, এটা শুভ লক্ষণ। অশুভের মধ্যে (শুদ্ধ ভাষায়) তাম্রকূট সেবন, বা (চল্‌তি অপভাষায়) সিগারেট ফোঁকা এবং রঙিন পানীয় সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নিষেধ অগ্রাহ্য করার কুরীতি এক দলের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে; আশা করি, তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে থাকবে।

৫. চালচলন॥ কবি যাঁকে ‘বিয়েপৈতের হিঁদু’ বলেছেন তা বাঙালি সমাজের অধিকাংশ লোক এখনো আছেন; বিশেষত মেয়েদের রক্ষণশীলতা প্রসিদ্ধ। কিন্তু ক্রিয়াকর্ম ছাড়া অপর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আদবকায়দা অনেক পরিমাণে লোপ পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রণাম করা, গুরুজন ঘরে এলে উঠে দাঁড়ানো, শ্বশুর ভাশুর স্বামীর নাম-না-করা প্রভৃতি গুরুলঘু সম্পর্কঘটিত প্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে। অপর পক্ষে করমর্দন ও মিসেস্ মিস্ যুক্ত সম্বোধনাদি ইংরিজি অনেক সামাজিক প্রথার চল হয়েছে। গৃহসজ্জা থেকে আরম্ভ করে নিমন্ত্রণ উৎসবাদি পর্যন্ত ঘরগৃহস্থালির সকল বিভাগেই বিদেশীয়ানার ছাপ দেখা যায়; তবে আগেকার সেই দোটানা দো-আঁশলা ভাব এখন অনেকটা পরিণত পারিপাট্য এবং ঐক্য লাভ করেছে, এই যা তফাত।

স্বেচ্ছাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহরূপ গুরুতর পরিবর্তন ব্রাহ্মেতর সমাজেও সম্প্রতি প্রবেশলাভ করেছে। আধুনিক উপন্যাস ও সিনেমা তার অন্যতম কারণ বলে বোধ হয়। সিনেমা একাই এক শো পরিবর্তনের নিদান বলা যেতে পারে। ভদ্রনারীর দেশী এবং বিলাতি নৃত্যে যোগদানের উল্লেখ না করলেও ফর্দ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

৬. কর্মপ্রসার ॥ বিচারমাত্রই তুলনামূলক। ত্রিশ বৎসর আগে ভদ্রলোকের মেয়েদের জীবনসংগ্রামে নামবার প্রয়োজন তেমন স্বীকৃত হয় নি, যদিও শিক্ষা ধাত্রীবিদ্যা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের উপার্জনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল; ঘরগৃহস্থালি তখনো মেয়েদের প্রধান কাজ বলে বিবেচিত হত, তবে ঘরে বসে সাহিত্য সংগীত-চর্চা এবং বাইরের জনহিতকর কাজে যোগ দেওয়া বহুকাল পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তার তুলনায় এখন ধর্মের হ্রাস হলেও কর্মের প্রসার শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্র পুরুষদের সমান না হোক, আবেদনে আন্দোলনে প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। এই দ্রুত প্রসারের ফলে বঙ্গনারীর মনোভাবের কী পরিবর্তন হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে তার জীবনে আরও কী পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা সেটি বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

৩

পূর্বে বলেছি, আধুনিক শিক্ষা স্বাধীনতা ও বিদেশীয়ানা এই ত্র্যহস্পর্শের তারতম্য অনুসারে বঙ্গনারীর পরিবর্তনের গতিবেগ নির্ণয় করা যেতে পারে। আবার 'ব্রাহ্মসমাজ বিলাতফেরতসমাজ হিন্দুসমাজ' 'ধনী মধ্যবিত্ত গরিব' 'সধবা বিধবা অধবা'— কত রকম ভাবে সে পরিবর্তনকে ত্রিধা বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত শিক্ষার ফলাফলের কথা ধরা যাক। অনেকদিন আগে 'বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার' শীর্ষক প্রবন্ধে সে শিক্ষার দোষগুণ আলোচনা করেছি। তার সারমর্ম এই যে, সাধারণত শিক্ষিতাদের এই কয়টি দোষে দোষী করা হয়— ধর্মভাবের হ্রাস, নম্রতা ও বাধ্যতার অভাব, গৃহকর্মে অপটুতা, স্বাস্থ্যহানি, বিলাসিতা ও আমোদপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা এবং বিদেশীয়তা। তার কতক দোষ খণ্ডন ও কতক স্বীকার করেছিলুম, কারণ 'দুঃখের বিষয়, সমাজ সংস্কার করিতে গেলেই পুরাতন মন্দের সহিত কতক ভালোও লোপ পায়, এবং নূতন ভালোর সহিত মন্দও আসিয়া পড়ে।' (ক্রিয়াপদের বিশুদ্ধতাতেই এই 'নারীর উক্তি'-র প্রাচীন বয়স ধরা পড়বে!) কিন্তু সেইসঙ্গেই বলেছিলুম যে, ক্ষতিপূরণের নিয়মানুসারে প্রায় প্রত্যেক দোষেরই অপর পৃষ্ঠায় একটি গুণ ফুটে উঠেছে। যথা ১. বুদ্ধির উদারতা বা সাম্যভাব, ২. আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান, ৩. সময়ের মূল্যবোধ, ৪. বেশভূষা ও গৃহসজ্জায় পারিপাট্য, ৫. গৃহ এবং পরিবারের বাইরেও মনকে প্রসারিত করা, ৬. স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী, সহকর্মিণী ও সুমাতা হওয়া। তা ছাড়া এও বলেছিলুম যে, যা-কিছু বদল দেখা যায়, সবই (বিশেষত মন্দগুলি!) শিক্ষার ঘাড়ে চাপানো অন্যায়। কালক্রমে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ইচ্ছে করলেও কেউ যেখানে আছে সেখানে বসে থাকতে পারে না; তবে বুদ্ধি থাকলে গতির মাত্রা ও দিক নির্ণয় করতে পারে।

ভালোমন্দ ॥ স্বাধীনতা ও বিদেশীয়তা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য— অর্থাৎ তাতে ভালো মন্দ দুই ফলই হয়েছে; এবং দুটি পরস্পরসাপেক্ষ শিক্ষার সঙ্গেও জড়িত। সুতরাং দোষগুণ উপরেই সূচিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে স্বাধীনতা যাতে স্বেচ্ছাচারে পরিণত না হয়

সেদিকে লক্ষ রাখা কর্তব্য— তবে সেটা 'বলিতে সহজ বটে, করিতে তা নয়'। কিন্তু সুশিক্ষার কোন্ বিভাগটাই সহজ? দুর্ভাগ্যবশত বিদেশীয়তার নিকৃষ্ট দিকটাই নকল করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলে সেইটিই বেশি প্রচলিত ও নিন্দনীয় হয়ে পড়েছে; কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, বিদেশীর কাছ থেকে অনেক ভালো জিনিস শেখবার আছে ও শেখানো অসম্ভব নয়। মায়েদের সতর্ক দৃষ্টি ও সযত্ন চেষ্টা থাকলে তাঁরা মেয়েদের সেকাল ও একাল, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, উভয় দেশকালের সদ্‌গুণে ভূষিত করে একটি নতুন কালোপযোগী আদর্শ গড়ে তুলতে নিশ্চয়ই অনেকটা সাহায্য করতে পারেন; এবং তা হলে একটা মস্ত কাজ করা হবে।

মন্দের ভালো॥ পূর্বোল্লিখিত আর্থিক অবস্থার দরুন বঙ্গনারীর সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের বিচার করতে হলে তার ফল ভালোই বলতে হয় এইজন্য যে, বিবাহরূপ ক্রমিক অনিশ্চিততর ঘটনার আশায় হাপিত্যেশ করে অনির্দিষ্টকাল পরের গলগ্রহ হয়ে ঘরে বসে না থেকে যদি মেয়েরা ছেলেদের মতোই বা অভাবপক্ষে একলাই উপার্জনশীল হয়ে পরিবারের আংশিক বা সম্পূর্ণ ভরণপোষণের ভার গ্রহণে সক্ষম হয়, তবে এ গরিব দেশে অনেক অসহায়ের উপকার এবং নিজেরও কিঞ্চিৎ লাভ হয়। যদিও সুখদুঃখসমন্বিত বিবাহিত জীবনই নারীমাত্রেরই সম্পূর্ণতা লাভের জন্য এখনো কাম্য মনে করি— বিশেষত এদেশে; তবুও যখন আর্থিক অবস্থার দরুন সেই শুভবিবাহের আশা অনেকের পক্ষে সুদূর-পরাহত হয়ে পড়ছে, তখন 'মন্দের ভালো' হিসেবে বঙ্গনারীর স্বোপার্জন বাঞ্ছনীয়— এমন-কি, বিবাহের পরেও, যদি অবশ্য গৃহস্থালির কর্তব্য সম্পাদন ক'রে তার অবকাশ ও শক্তি অবশিষ্ট থাকে। এ স্থলে সর্বদাই

স্মরণীয় এই যে, মেয়েরা পুরুষের মতো বাইরের কাজ করলেও পুরুষের মতো ঘরের কাজ বাদ দেওয়া তাদের চলবে না; এবং এই দুদিকের বোঝা সামলানোর মতো শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য আমাদের মেয়েদের মধ্যে বিরল। তাই সধবাদের পক্ষে ঘরে বসেই সম্ভবমত রোজগারের চেষ্টা করাই ভালো— যদি করতেই হয়। অন্যদের পক্ষে আর-একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত; সেটি এই যে, পারতপক্ষে এমন পেশা অবলম্বন না করাই ভালো যাতে মেয়েদের মানসম্ভ্রম ও শীলতার হানি হওয়া সম্ভব।

গৃহধর্মপালন॥ যে বাইরের কাজ রোজকারের উদ্দেশ্যে নয়, পরন্তু সমাজহিতৈষণায় গ্রহণ করা হয়, সে কাজ যে শিক্ষিত বঙ্গনারীর পক্ষে একান্ত গ্রহণীয় এবং প্রশংসনীয়, তা বলাই বাহুল্য। তবে এ স্থলেও আমাদের মেয়েদের কতকগুলি কথা মনে রাখতে বলি।

১. শুধু খাতিরে বা দায়ে পড়ে যেন তাঁরা এমন কাজ হাতে না নেন, যার প্রতি তাঁদের মনের স্বাভাবিক টান নেই; এবং এত বেশি কাজের ভার যেন না নেন যাতে কোনোটার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে না পারেন। দ্বিতীয়ত, যদি বাইরের কাজ হাতে নিলে ঘরের কাজের (বা স্বাস্থ্যের) ক্ষতি হয়, আমি বলি, একেবারে না নেওয়াই ভালো। ২. মায়েদের বলি— এখনো যতদূর পার নিজেরা শিক্ষিত হবার চেষ্টা করো, এবং মেয়েদের শিক্ষা দেবার সাহায্য করো। ৩. মেয়েদের বলি— শরীরপাত না করে যতটা পার জীবনের এই অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করো, শুধু পাসকরা মেয়ে না হয়ে চৌকোশ মানুষ হবার চেষ্টা করো, এবং নিজে যে সুবিধে-সুযোগ পেয়েছ, পরকে তার অংশ দাও। ৪. চিরকুমারী ও বালবিধবাদের বলি— নিজেদের

সংসার হল না বলে বৃথা আক্ষেপ না করে যতটুকু পার পরকে আপন করবার চেষ্টা করো, দেখবে সে শূন্য ক্রমে পূর্ণ হয়ে উঠবে। একজন সাধু ব্যক্তি বলতেন 'কর্ম বন্ধু', সে কথা যথার্থ। ৫. সধবাদের বলি— গৃহকর্মপালন করবার মধ্যেও সমাজধর্ম যে কতটা এসে পড়ে, সেটা যেন তাঁরা ভেবে দেখেন; তা হলে ক্ষুদ্রতম গৃহকেও সংকীর্ণ মনে হবে না।

শুধু আত্মীয়স্বজন দাসদাসী অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি যথাযথ সদ্‌ব্যবহারে যে সদ্দৃষ্টান্ত হিসেবে যথেষ্ট সামাজিক কাজ করা হয়, তা নয়; অশন আসন বসন ভূষণ গৃহসজ্জা নিমন্ত্রণাদি সব ক্ষেত্রেই সুগৃহিণীরা অল্প খরচে সুন্দর ও স্বদেশী -ভাবে সুব্যবস্থা করতে পারলে সমাজের একটা মস্ত হিতসাধন করা হয়।··· সুখের সংসার গড়ে তোলা অপেক্ষা শ্রেয় ও স্বাভাবিক কাজ সাধারণ মেয়ের পক্ষে কী থাকতে পারে তা তো ভেবে পাই নে।

মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, প্রথমবয়সে শিক্ষা, মধ্যবয়সে সংসার ও শেষবয়সে লোকহিত— এই ত্রিধারায় জীবন চালাতে পারলে সেকালের চতুরাশ্রম ও একালের যুগধর্ম দুদিকই রক্ষা করা হয় (আবার ত্রিধারা !)। সেকালের ধীরাস্থিরার সঙ্গে একালের বীরা হতে হবে; অথবা সেকালের শ্রী ও হ্রীর সঙ্গে একালে ধী মেলাতে হবে— বঙ্কিমবাবু হলে যাকে বলতেন প্রখরে-মধুরে-মেশা। এই সামঞ্জস্যই নারীজীবনের মূলমন্ত্র।

নারীর উক্তি

কঃ পন্থা

কোন্ পথে চললে এ যুগের বঙ্গনারীর সত্যিই অগ্রগতি হবে, সেইটে বোঝবার চেষ্টাতেই এত কথা বলা ও ভাবা। ঠিক গতানুগতিক পন্থা নবযুগে চলবে না, পূর্বেই বলেছি; কারণ, চতুর্দিকের অবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটবেই, তখন একমাত্র নারীকে ঠিক পূর্বস্থানে অবিচলিত রাখা অসম্ভব। আবার শিক্ষার ক্রিয়া আরম্ভ হলেই সংস্কার বদলায়, নতুন মত গড়ে ওঠে, পুরনো বিশ্বাসের ভিত্তি টলে, সমাজ কম্পমান হয়। সেটা আরামের অনুকূল না হলেও জীবনের লক্ষণ বটে। এখন আমাদের সেই অবস্থা।

শুধু মেয়েদের কেন, অন্যান্য দুর্বলপক্ষেরও এখন সেই একই অবস্থা। আমি বরাবরই বলে থাকি যে, সমাজে চার প্রকার সবল-দুর্বল জুড়ি সচরাচর দেখা যায়: ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-প্রজা ও পুরুষ-স্ত্রীলোক। আর শেষোক্ত, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এই চার প্রকার দুর্বলতাই একাধারে মিশেছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরোর্ধ্ব স্ত্রী-শিক্ষার পর আজ আর সে কথা বলবার জো নেই। অন্যান্য দুর্বলপক্ষের মতো, কেবল সবলের চরণে আত্মবলিদান ভিন্ন যে উপায়ান্তর নেই, সে পূর্ব-সংস্কার ঝেড়ে ফেলে তাঁরাও নির্ভয়ে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

মেয়েদের দাবি॥ আধুনিক শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের জন্য যে-সকল দাবি উপস্থাপিত করেন, সেগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারা যায়—

ক. আইনঘটিত সংস্কার॥ যথা, উত্তরাধিকারস্বত্ব বিবাহ-ব্যবস্থা ইত্যাদি।

খ. সমাজঘটিত সংস্কার ॥ যথা, শিক্ষা পর্দাপ্রথা পণপ্রথা স্বেচ্ছা-বিবাহ স্বোপার্জন ইত্যাদি।

গ. পরিবারঘটিত সংস্কার ॥ যথা, কিঞ্চিৎ নিজস্ব টাকা, নিজস্ব অবসর, নিজস্ব মতামতে অধিকার, জন্মনিরোধ, যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রাপ্তি ইত্যাদি।

ঘুরে ফিরে অনেক সমস্যাই শেষে অর্থনৈতিক সমস্যায় গিয়ে পৌছয়। সেই অনুসারে মনের ভাবেরও পরিবর্তন হয়। দুঃখের বিষয়, অবস্থা-পরিবর্তন ও মনোভাব-পরিবর্তন সব সময়ে সমপদক্ষেপে চলে না। তাই নানা অসামঞ্জস্য বিক্ষোভ ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। হয়তো মুসলমান-অত্যাচারের ভয়ে পর্দার প্রচলন হয়েছিল; কিন্তু সে আমল চলে গেল, —পর্দা রয়ে গেল। হয়তো অনার্য সংস্পর্শের ভয়ে জাতিভেদের ব্যবস্থা হয়েছিল; কিন্তু আর্য-অনার্য মিশে গেল— জাতিভেদ রয়ে গেল। এইখানেই আমাদের হিন্দুসমাজের দুর্বলতা। কেবল অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে, বর্তমান অবস্থা বুঝে ভবিষ্যতের নববিধান সময়মত গড়ে তুলতে পারে না। আর, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে পারে না। ভোগের চেয়ে ত্যাগ ভালো, সে কথা মানি— কিন্তু কেবল মেয়ের পক্ষে, পুরুষের পক্ষে নয়? সেবাকে উচ্চ ধর্ম বলেই জানি; কিন্তু এক-পক্ষ কেবলই দেবে, আর একপক্ষ কেবলই নেবে? এ অন্যায় অবিচার চিরদিন চলে না। তাই হিন্দুসমাজকে একদিন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে— যদি বাঁচতে চায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষালাভে ঘরে ঘরে সুখশান্তি ও সুশৃঙ্খলা বৃদ্ধি হবে; উত্তরাধিকার বা দান-সূত্রে কিঞ্চিৎ নিজস্ব অর্থলাভে ঘরে ঘরে তাদের সম্মান ও সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি হবে;

স্বেচ্ছাবিবাহ এবং স্বোপার্জনের অধিকারলাভে ঘরে ঘরে তাদের আত্ম-সম্মান আত্মনির্ভর এবং স্বাচ্ছন্দ্যসচ্ছলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হবে।

উত্তরাধিকারস্বত্ব ॥ এই পরিবর্তনগুলির বাঞ্ছনীয়তা মোটামুটি স্বীকার করলেও ব্যক্তিগতভাবে দু-একটি টিপ্পনী করা আবশ্যক মনে করি।

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যতটা ঘোঁট করা হয় ততটা করা দরকার কি না, সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়। এ দেশে শতকরা এত নগণ্যসংখ্যক লোকের এমন বিষয় আছে যা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া সার্থক, তার জন্য স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের মজুরি পোষায় কি? অবশ্য যাদের আছে তারা উত্তরে বলবে— হাঁ। তার পর প্রশ্ন ওঠে যে, ক. মেয়েদের বিয়ে হয়ে শ্বশুর-পরিবারভুক্ত হওয়াই যখন নিয়ম, তখন সেদিককার এবং এদিককার দুইদিকেরই উত্তরাধিকারে তারা ভাগ বসাতে চাইলে একটু অন্যায় দাবি করা হয় না কি? খ. তাই আমার মনে হয় যে, শ্বশুরপক্ষের, অর্থাৎ স্বামী ও শ্বশুরের বিষয়ের, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মেয়েদের অভাব-অভিযোগ পূরণ করাই বেশি জরুরি কাজ। অপর-পক্ষে গ. ধনী বাপের কাছে বিয়ের সময় মেয়েরা যদি একটা থোক টাকা (বা টাকায় যা রূপান্তরিত করা যায় এমন বাড়ি বা বিষয়) পায় তো উত্তরাধিকারে পাওয়ার চেয়ে কাজে দেখে; কারণ তাঁর মৃত্যুরূপ অনিশ্চিত তারিখের চেয়ে নিজের নবজীবনের সূত্রপাতে টাকার সাহায্য পেলে তাদের বেশি ভোগে আসে।

পণপ্রথা ॥ এই সূত্রে পণপ্রথা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার একটু উল্টা টান টানতে বাধ্য হব। ধনী পিতার কাছে পণগ্রহণ তখনই দোষের বলব, যখন বরপক্ষ সে টাকা নিজের সিন্ধুকজাত করেন এবং তার উপর মেয়ের কোনো হাত থাকে না। নইলে মেয়েকে নিজস্ব স্ত্রীধন

বলে বাপ যদি স্বেচ্ছাপূর্বক কিছু দেন, সেটা সুখেরই বিষয় এবং উচিত কাজই হয়। বিশেষত যদি তাতে সমান ঘরে-বরে না দিতে পেরে থাকেন। বরপণ-প্রথা যে এত নিন্দনীয় হয়েছে, তার কারণ অক্ষম বাপের উপর জবরদস্তি জুলুম করে অতিরিক্ত টাকা বরপক্ষ শর্ত করে নিজের জন্য চান। যদি মেয়ের বিয়ের সময় বাপকে অবস্থানুসারে কন্যার স্নেহের দাবি স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে মেটাতে দেওয়া যায় তবে বরপণ-প্রথার বিষদাঁত ভেঙে যায়। কিন্তু যতদিন মেয়েদের সম্বন্ধে উভয়পক্ষেরই ধারণা উচ্চতর না হয়, ততদিন বোধ হয় ন্যায়-বিচারের জন্য মেয়েদের আইনের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। দুঃখের বিষয়, এখনো পর্যন্ত বাপেরা মেয়েদের পরহস্তগত করতে এবং বরেরা কনের পাওনাথোওনা নিজ হস্তগত করতে যত ব্যস্ত, মেয়েদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোনো পক্ষকেই তত ব্যস্ত হতে সাধারণত দেখা যায় না।

সামাজিক সমস্যা॥ বিবাহ-ব্যাপার আর-এক মহাসমস্যা, যা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই; বিশেষত স্বেচ্ছাবিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্ন সম্বন্ধে। প্রথমটি স্বীকার করলে জাতিভেদরক্ষা দায় হয়ে পড়ে, অর্থাৎ হিন্দুসমাজের মূলে কুঠারঘাত পড়ে। অথচ এই বয়স্থা ও শিক্ষিতা কন্যার প্রবল বন্যার মুখে সেই পুরনো পরমুখাপেক্ষী পাত্রপাত্রী-নির্বাচনপ্রথা বজায় রাখবার আশা যে দুরাশা মাত্র, তা ফলেন পরিচীয়তে। তাই হিন্দুসমাজের পক্ষে এ বিষয়ে প্রসন্নমনে ব্রাহ্মসমাজের পন্থানুসরণ করাই বুদ্ধির কাজ; এবং গৌরবিলের প্রসাদে সে কাজ অনেক সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে— অর্থাৎ জাত ছাড়লেও সমাজ ছাড়তে হয় না, সেই এক মস্ত সুবিধে।

বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্ন জটিলকুটিলতর। তার সমস্ত গ্রন্থিভেদ করতে এ ক্ষেত্রে চেষ্টা করব না। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, দাম্পত্য জীবনে এমন অবস্থা যদি দাঁড়ায় যা স্ত্রীর পক্ষে একান্ত অসহ্য, তা হলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবার একটা বৈধ পথ তার জন্য খোলা রাখা নিতান্ত আবশ্যক (অবশ্য যথাযোগ্য আটঘাট বেঁধে রেখে, যাতে বিবাহবন্ধনের মর্যাদা তুচ্ছ কারণে উপেক্ষিত না হতে পারে); নইলে দণ্ডে মারা বলে যে একটা চলতি কথা আছে তা অনেক ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হতে বাধ্য।

সামাজিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইনের প্রবেশ অনধিকার এবং অবাঞ্ছনীয় মনে হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু যদি সমাজের মানুষে পরস্পরের প্রতি ঠিক ঠিক সামাজিক নীতি ও সম্পর্ক -অনুসারে শাস্ত্রানু-মোদিত ব্যবহার করত, তা হলে কোনো আইনের কি দরকার হত —কি পুরুষের, কি মেয়ের পক্ষে? নিরঙ্কুশ মানুষের মন নির্ভরযোগ্য নয় বলেই আইনরূপ অঙ্কুশের সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়েছে। এবং সেটা যত সমদর্শী হয়, ততই সভ্যসমাজের যোগ্য।

যা হোক, এই-সকল খুঁটিনাটি বাছবিচার বাদ দিয়ে আসল কথা হচ্ছে এই যে, যেগুলি বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন, তার জন্য উঠে-পড়ে মেয়েদের চেষ্টা করা উচিত— লিখে, বলে, বুঝিয়ে, পড়িয়ে, খেটেখুটে, দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, যে যেমন করে পারে।··· কোন্‌টি বাঞ্ছনীয়, কোন্‌টি নয়, সে-বিষয়ে নিক্তির ওজন বলে দেওয়া শক্ত। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, কেবলমাত্র নকল করে, নিজের মনে বিচার করে দেখে আস্তে আস্তে এগোতে থাকলে বেশি দূর ভুলপথে যাবার সম্ভাবনা কম; এবং কিছুদূর গেলেও ফেরা অসম্ভব। এ দেশের মেয়েদের জন্য কিছু

দাবি করতে হলে— প্রথমে ভেবে দেখতে হবে, সে অধিকার কেবলমাত্র বিদেশী মেয়েদের আছে বলে, না, এ দেশের মেয়েদের পক্ষে বাস্তবিক বাঞ্ছনীয় বলে চাওয়া হচ্ছে। উক্ত পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় হলেও আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তা এ দেশে বাস্তবে পরিণত হবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না।

অধিকার— স্থূল ও মূল ॥ শেষোক্ত শর্তের উল্লেখ করেছিলুম বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার বৃথা চেষ্টা ও সময়ের অপব্যয় নিবারণকল্পে। কারণ অনেক স্থূল ও মূল অধিকারেই যখন এ দেশের নারীসাধারণ এখনো বঞ্চিত, যথা, স্বাস্থ্য শিক্ষাদি— তখন অপর দেশের নারী (যাঁরা পুরুষের সমকক্ষতা দাবি করছেন) তাঁদের সমকক্ষতা এখনই দাবি করা আমাদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ দেশের মেয়েদের যুদ্ধে সৈনিকপদ গ্রহণ করবার কথা উল্লেখযোগ্য ; সত্য কথা বলতে গেলে আমার কল্পনার ঘুড়ি অত ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণ করতে অক্ষম ; কারণ মাটির সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হবার ভয় রাখে। তবে আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতারা আন্তরিকভাবে যে-সকল অধিকার দাবি করেন, (অবশ্য নীতিবিরুদ্ধ না হলে) সেগুলি তাঁদের দেওয়া উচিত বলে মনে করি। কিন্তু তাঁদের প্রতিও দু-একটি সবিনয় নিবেদন আছে—

প্রথমত, তাঁরা ভেবে দেখুন সাধারণভাবে স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ভেদ তাঁরা স্বীকার করেন কি না, শুধু শারীরিক অবশ্যস্বীকার্য ভেদ নয়, উপরন্তু মানসিক স্বাভাবিক সামাজিক জৈবিক নানাপ্রকার 'ইগন্ত' ভেদ। দ্বিতীয়ত, তাঁরা ভেবে দেখুন অপরদেশীয় নারীর সঙ্গে ভারত-নারীর আদর্শগত ভেদ স্বীকার করেন কি না, যে আদর্শ পরিবর্তিত আকারেও রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

যদি প্রথম প্রস্তাবটি গ্রাহ্য করেন, তা হলে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের যে মা ও স্ত্রী হবার সম্ভাবনা, তার জন্য তাদের আগে থেকে প্রস্তুত করবার আবশ্যকতা এবং তাদের পক্ষে অবিকল পুরুষালি শিক্ষাদীক্ষার অনুপযোগিতাও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। তবে আমিও ন্যায়নিষ্ঠ কৌঁসুলী হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য যে, আজকাল যখন সকলের পক্ষে শুভবিবাহ ক্রমশ অনিশ্চিতের কোঠায় গিয়ে পড়ছে তখন মেয়েদেরও কোনো একটা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া এবং অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর করে দেওয়া উচিত। আগেই বলেছি যে, ঘরে ও বাইরে, দুদিকের ঠেলা সামলাবার মতো শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য বিলেতের মেয়েদের মতো আমাদের অধিকাংশ ভদ্র-ঘরের মেয়েদের নেই; যদিও নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের অনেকের দায়ে পড়ে তা করতে হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রাহ্য করলে অনেক বিষয়ে বিদেশী অনুকরণ থেকে বিরত হতে হবে। এককথায় বেশভূষা চলাফেরা পানাহার মেলামেশা আমোদপ্রমোদ সকলের মধ্যে সংযমের বাঁধ দিতে হবে, এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে হবে, স্রোতের টানে ভেসে গেলে চলবে না। সে দাঁড়ি ক্রমশ সরবে অবশ্য, কিন্তু কোন্ সময়ে কতদূর পর্যন্ত, সেটা বাপ-মায়ের ও মেয়েদের নিজের সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে।

সেকালের বঙ্গরমণীর এক রেখাচিত্র আমি কল্পনা করেছি—শ্রী যাঁদের সম্পদ, হ্রী যাঁদের ভূষণ, ধী যাঁদের সহায়; স্নেহ যাঁদের অগাধ, ক্ষমা যাঁদের অপার, ধৈর্য যাঁদের অসীম; কর্ম যাঁদের বন্ধু, ধর্ম যাঁদের রক্ষক; মন যাঁদের সরল, বাক্য যাঁদের মধুর, সেবা যাঁদের অক্লান্ত; যাঁরা আত্মসুখে উদাসীন, পরদুঃখে কাতর, অতি অল্পে সন্তুষ্ট।

কিন্তু এ ছবি যতই সুন্দর ও সম্পূর্ণ হোক, একালে এর মূল্য কমে গেছে, রঙ রেখা মুছে গেছে ও পরিপ্রেক্ষিত বদলে গেছে, তা বুঝতে পারছি। তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।

মধ্যপন্থা॥ অতএব, আধুনিকাদেরই অনুরোধ করছি, তাঁরা সিয়াই কলমে এঁকে না হোক, নিজের জীবন দ্বারাই একেলে বঙ্গনারীর এমন নতুন ও কালোপযোগী এক মূর্তি গড়ে তুলুন, যা দেখে বাংলার আপামর সাধারণ নব্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে ও ধন্য ধন্য করবে।

আমরা বাস্তবিকই সেকেলে হয়ে পড়েছি, তা পদে পদে বুঝতে পারি। মানুষে বড়ো জোর দ্বিকালজ্ঞ হতে পারে— অতীত ও বর্তমান এই দুই কালেরই সাক্ষ্য দিতে পারে। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ হওয়া শক্ত। ভবিষ্যৎ বংশ থেকে আমরা বেশি দূরে পড়ে গেছি; তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাপকাঠি আমাদের হাতে নেই। তাই আমরা যতটা সাবধান করতে পারি, ততটা উৎসাহ দিতে পারি নে। তবু সাবধানের বিনাশ নেই কথায় বলে— সে জিনিসও কিছু মন্দ নয়। আগে সমাজ ছিল প্রবল, এখন ব্যক্তি হয়েছে বা হতে চাচ্ছে প্রবল। সেই পুরনো 'কাশী যাই কি মক্কা যাই' -এর বদলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে পুবে যাই কি পশ্চিমে যাই? য়ুরোপ তার কৃতিত্ব প্রভুত্ব ও ধনমদমত্ত মূর্তি ধরে সোৎসাহে বলছে— 'এগোও!' প্রাচীন ভারত তার ত্যাগশ্রীমণ্ডিত হৃতগৌরবে অস্পষ্ট রূপ ধরে ক্ষীণকণ্ঠে বলছে— 'দাঁড়াও, ফিরে চাও!' এই উভয়-সংকটে পড়ে আমরা একবার গার্টনে ছুটছি, একবার গুরুকুলে দৌড়চ্ছি। আমি মধ্যপথেরই পক্ষপাতী— মধ্যপথই স্বর্ণপন্থা। তাই, এই চৌমাথায় খাড়া দ্বিধাগ্রস্ত পথচারিণীকে ডেকে অনাহূত পরামর্শ দিচ্ছি— সেই মধ্যপথ ধরে যাও যেখানে পূর্ববাহিনী পশ্চিবাহিনী নদী একত্র

মিলিত হয়েছে; সেই পবিত্র সংগমে মুক্তিস্নান করে নবকলেবর নবশক্তি ধারণ করো। বেশি দূরে যেতে হবে না, তোমারি দেশের আকাশে বাতাসে যে মূর্তি ভেসে বেড়াচ্ছে, কত পুরাণে কাব্যে ঋষিবাক্যে যার মহিমা কল্পিত কথিত কীর্তিত হয়েছে— সেই দুর্গা দুর্গতিনাশিণী, সেই কমলা দুঃখহারিণী, সেই বাণী বিদ্যাদায়িনীর ত্রিমূর্তির একত্র সমাবেশ করো, ধ্যান করো, সাধনা করো, অবশ্য সিদ্ধিলাভ হবে। এক হাতে পুরুষ-জাতিকে বরদান করো, আর-এক হাতে স্বজাতিকে অভয়দান করো, উদ্ধার করো। আমরা মন্ত্র পাঠ করি—

বাঁধন-ছেঁড়া সাধন হবে
মাভৈ মাভৈ মাভৈ মাভৈ রবে।

আমরা আশীর্বাদ করি—

শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দ

—

নারীর উক্তি ১৯২০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়— দীর্ঘকাল গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য ছিল। নূতন সংস্করণে 'সমালোচকের পত্র' ও অনূদিত প্রবন্ধ 'গ্রীস ও রোম' বর্জিত এবং 'বঙ্গনারী' প্রবন্ধটি নূতন সংকলিত হইল।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৫৮

রচনাগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী

বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার	ভারতী। শ্রাবণ ১৩১৯
সম্বন্ধ	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২২
আদর্শ	সবুজ পত্র। ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২
ভদ্রতা	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২৪
পাটেল-বিল	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২৫
বঙ্গনারী : কঃ পন্থা	শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৭

বঙ্গনারী [১], ২ ও ৩ অংশও যথাক্রমে 'বঙ্গনারী— কি ছিল' 'বঙ্গনারী— কি হল' এবং 'বঙ্গনারী— কি হতে চলিল' এই শিরোনামে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত

মূল্য ৩·৫০ টাকা